বাবা দিবসের
বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২০ ২১ - ২৭ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

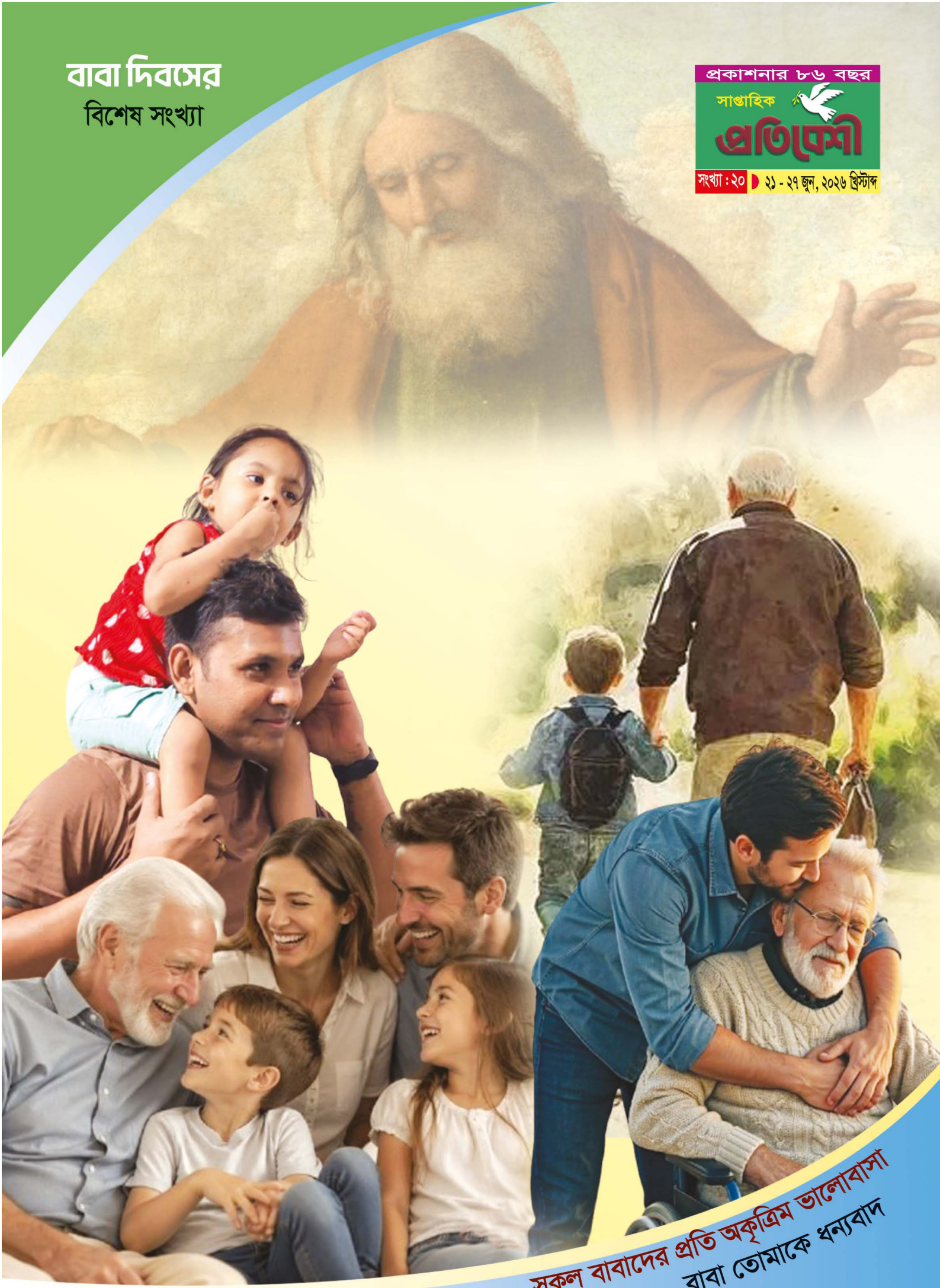

সকল বাবাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা
বাবা তোমাকে ধন্যবাদ

প্রয়াণের পঞ্চদশ বর্ষ

সিস্টার মেরিয়ান তেরেজা গমেজ, সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

"যেতে নাহি দেব হায়,
তবু যেতে দিতে হয়।"

সময় কত দ্রুত পেরিয়ে যায়। পনেরোটি বছর কম কথা নয়। মনে হয় এই তো সেদিন ফ্রান্সে গেলে। সেখান থেকে আর ফেরা হলো না। তোমার এ যাওয়াটা আজও যেন মেনে নিতে পারছি না। আমাদের কথা হয় বাদই দিলাম। মায়ের কথা একবার ভেবে দেখো, প্রথমে দু'জন সবশেষে তোমাকে হারিয়ে মা পাগলপারা। দিবা নিশি অশ্রুসিক্ত নয়নে কেবলই বলত "ও মা তিরু তুমি কোথায় গ্যালা, আমারে তোমার কাছে নিয়া যাও।" তুমি শুনেছিলে সে কান্না। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তুমি মাকে তোমার কাছে নিয়ে গেছ। তোমরা এখন আছ মহা শান্তি মাঝে। আমাদের আশীর্বাদ করো, তোমাদের জীবনাদর্শ যেন হয় আমাদের চলার পথের পাথেয়।

তোমারই স্নেহধন্য
ড. লরেন্স গমেজ, সুজান গমেজ
এবং
গমেজ পরিবার।

বিজ্ঞ/১২৭/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন। অথবা বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হলে এই নাম্বারে পাঠাবেন। বিকাশ : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (খরচ সহকারে)
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ২৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪৫
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২০
২১ জুন - ২৭ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৭ আষাঢ় - ১৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পরম পিতার প্রতিচ্ছবি হোন পৃথিবীর বাবারা

সাধারণত জুন মাসের তৃতীয় রবিবারে বিশ্ব বাবা দিবস পালন করা হয়। এ বছর তা ২১ জুন পালিত হচ্ছে। বাবা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় একজন বাবার নীরব আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং পরিবারের প্রতি তাঁর গভীর দায়িত্ববোধের কথা। এই দিনটি শুধুমাত্র জাগতিক বাবাদের সম্মান জানানোর উপলক্ষ নয়; বরং আমাদের দৃষ্টি তুলে ধরে সেই পরম পিতার দিকে, যাঁর প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর প্রতিটি স্নেহময় বাবার মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় প্রতিফলিত হয়।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে ঈশ্বরকে আমরা পিতা হিসেবে দেখি। তিনি সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, ভালোবাসাময়, নির্ভরযোগ্য ও সদাযত্নশীল। একজন পিতা যেমন তাঁর সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন, তেমনি পরম পিতাও সর্বদা তাঁর সন্তানদের যত্ন নেন। মানুষ ভুল করলেও তিনি উদারতায় ক্ষমা করেন, আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সংশোধনও করেন। যিশুর শিক্ষায় আমরা দেখি, ঈশ্বর এমন এক পিতা যিনি হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে বুকে টেনে নেন এবং তার প্রত্যাবর্তনে আনন্দ করেন।

এই পরম পিতার ভালোবাসারই প্রতিফলন আমরা খুঁজে পাই পৃথিবীর বাবাদের মধ্যে। একজন বাবা পরিবারের জন্য নীরব আত্মত্যাগী। তিনি নিজের কষ্ট, দুঃখ ও সীমাবদ্ধতাকে আড়াল করে সন্তানদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন। পরিবারকে ভালো ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য জীবনের নানা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। অনেক সময় তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ কম হলেও পরিবার ও সন্তানের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ কখনও কমে না। তিনি যেন পরিবারের ছায়াদানকারী এক বিশাল বটবৃক্ষ, যার শিকড় গভীরে প্রোথিত এবং যার আশ্রয়ে সন্তানরা নিরাপদে বেড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন বাবা পরিবারের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তিনি সংগ্রামী ও সাহসী। তাঁর ভালোবাসা অনেক সময় উচ্চারিত হয় না, কিন্তু তা প্রকাশ পায় দায়িত্ববোধ, শ্রম ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে। বাবা দিবসে আমরা বাবাদের আত্মনিবেদনকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তবে বাবা দিবস কেবল প্রশংসা ও শুভেচ্ছার দিন নয়; এটি আত্মসমালোচনা ও নবায়নেরও একটি সুযোগ। বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, কর্মব্যস্ততা, অভিবাসন, অর্থনৈতিক চাপ এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে পরিবারে সম্পর্কের ধরনও বদলে যাচ্ছে। অনেক বাবা সন্তানের জন্য সবকিছু করতে চান, কিন্তু তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আবার অনেক সন্তানও বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতার চর্চায় পিছিয়ে পড়ছে। যে বাবা সারাজীবন সন্তানদের জন্য সংগ্রাম করেছেন, বার্ধক্যে এসে তাঁর মনের নিভৃত কোণে একটি ছোট্ট প্রত্যাশা জন্ম নেয়–সন্তান যেন তাঁকে একটু আরাম দেয়, সম্মান করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান সমাজে বৃদ্ধ পিতাদের প্রতি উদাসীনতা ও অসম্মান লক্ষ্য করা যায়। অনেক বৃদ্ধ পিতাকে চরম ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়। বার্ধক্যের ভার বহন করেও তাঁদের প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়।

খ্রিস্টীয় পরিবারে বাবার দায়িত্ব শুধু উপার্জন করা নয়; তিনি পরিবারের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকও। সন্তানেরা প্রথমে বাবার জীবন থেকেই বিশ্বাস, সততা, ক্ষমা ও মানবিকতার শিক্ষা লাভ করে। বাবা যদি প্রার্থনা ও মাণ্ডলিক কাজে অংশগ্রহণ করেন, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলেন, তবে সেই মূল্যবোধ সন্তানদের জীবনেও গভীর ছাপ ফেলে। বর্তমান সময়ে আমাদের প্রয়োজন এমন বাবাদের, যারা সন্তানদের শুধু সফল মানুষ নয়, বরং সৎ, বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

বিশ্ব বাবা দিবসে আমরা সকল বাবার জন্য প্রার্থনা করি। পরম পিতা তাঁদের শক্তি, প্রজ্ঞা ও সাহস দান করুন, যাতে তাঁরা নিজেদের পরিবারে ঈশ্বরের ভালোবাসার জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে উঠতে পারেন। †

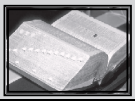

যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব। (মথি ১০:৩৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

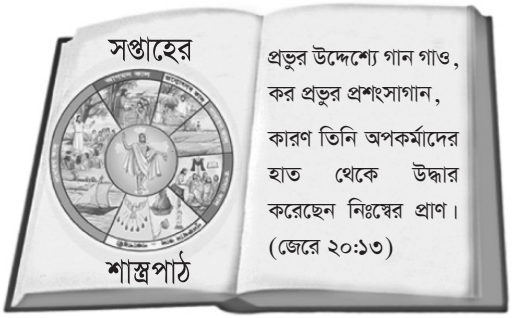

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ জুন - ২৭ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২১ জুন, রবিবার
সাধারণকালের ১২তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
জেরে ২০: ১০-১৩, সাম ৬৯: ৭-৯, ১৩, ১৬, ৩২-৩৪, রোম ৫: ১২-১৫, মথি ১০: ২৬-৩৩

২২ জুন, সোমবার
সাধারণকালের ১২তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
২ রাজা ১৭: ৫-৮, ১৩-১৫ -- ১৮, সাম ৬০: ১-৩, ১০-১১, মথি ৭: ১-৫

২৩ জুন, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১২তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
২ রাজা ১৯: ৯-১১, ১৪-২১, ৩১-৩৫-৩৬, সাম ৪৮: ১-৩, ৯-১০, মথি ৭: ৬, ১২-১৪

২৪ জুন, বুধবার
দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব, *মহাপর্ব*
ইসা ৪৯: ১-৬, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৫, শিষ্য ১৩: ২২-২৬, লুক ১: ৫৭-৬৬, ৮০

২৫ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১২তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
২ রাজা ২৪: ৮-১৭, সাম ৭৯: ১-৫, ৮-৯, মথি ৭: ২১-২৯

২৬ জুন, শুক্রবার
সাধারণকালের ১২তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
২ রাজা ২৫: ১-১২, সাম ১৩৭: ১-৬, মথি ৮: ১-৪

২৭ জুন, শনিবার
সাধারণকালের ১২তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
বিলা ২: ২, ১০-১৪, ১৮-১৯, সাম ৭৪: ১-৭, ২০-২১, মথি ৮: ৫-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ জুন, রবিবার
+ ১৯৬৭ ফা. খ্রীষ্টফার ব্রুক্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৮ ফা. ক্যারেন্স লী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সি. মেরী ক্ল্যাব, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২৫ ফা. লেনার্ড শঙ্কর রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

২৪ জুন, বুধবার
+ ২০০৭ সি. মেরী গ্রেস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সি. ভিনচেন্সা হালদার, এসসি (খুলনা)
+ ২০২৪ সি. মেরী লিলিয়ান, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৫ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৪ সি. পেলাজি, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৪ ফা. মাইকেল বিয়াক্কি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সি. রেনাতা আন্তেজিয়ানো, ওএসএল (খুলনা)
+ ২০০৪ সি. ভিনসেন্সা হালদার, এসসি (খুলনা)
+ ২০১১ সি. মারিয়ান তেরেসা, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. ফ্রান্সিস টি. রুরাম, এসএসএমআই (ময়ঃ)

২৬ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৭৬ ফা. যোসেফ পেরুমাত্তাম (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. পল তেরেজা গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ জুন, শনিবার
+ ১৯৮৬ সি. মারী এমি, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯০ ফা. জিওভান্নি বার্বে, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সি. ভির্জিনিয়া রোজারিও, সিআইসি (দিনাজপুর)

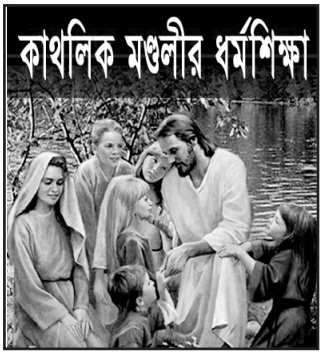

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২০০ চতুর্থ আজ্ঞা পালন নিয়ে আসে পুরস্কার: "তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভুমি দিচ্ছেন সেই দেশভুমিতে তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও।" এই আজ্ঞা মেনে চললে আধ্যাত্মিক ফলের সঙ্গে পার্থিব ফল হিসেবে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে এই আজ্ঞা পালনে ব্যর্থতা সমাজ ও ব্যক্তির জন্য বয়ে আনে বিরাট ক্ষতি।

(ক) ঐশ্ব পরিকল্পনা পরিবার

পরিবার প্রকৃতি

২২০১ দাম্পত্য জীবনপ্রসুত সমাজ স্বামী-স্ত্রীর সম্মতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। বিবাহ এবং পরিবার স্বামী-স্ত্রীর মঙ্গল এবং সন্তান প্রজনন ও শিক্ষাদানের জন্যই নিবেদিত। দাম্পত্য প্রেম ও সন্তানের জন্মদান একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং মৌলিক দায়িত্ব সৃষ্টি করে।

২২০২ নর এবং নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে একত্রে পরিবার গঠন করে। এই বিবাহ-প্রতিষ্ঠান কোন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের পূর্ব-স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না, বরং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে স্বীকৃতি দেয়া। এই স্বাভাবিক মানদণ্ডের দ্বারাই বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক।

২২০৩ নারী এবং নর সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বর মানবপরিবার স্থাপন করেছেন এবং মৌলিক গঠন-প্রকৃতি দিয়ে তাকে ভূষিত করেছেন। পরিবারের সকল সদস্যদের ব্যক্তিমর্যাদা সমান। পরিবার এবং সমাজের সাধারণ মঙ্গলের স্বার্থেই পরিবারে অত্যাবশ্যক বহুবিধ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় পরিবার

২২০৪ "খ্রীষ্টীয় পরিবার হচ্ছে মাণ্ডলিক মিলন-সমাজের এক বিশেষ প্রকাশ ও বাস্তবায়ন, আর এই কারণে পরিবারকে *গৃহমণ্ডলী* বলা যেতে পারে এবং তা বলা উচিত"। পরিবার হচ্ছে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার সমাজ। খ্রীষ্টমণ্ডলীতে এর গুরুত্ব অনন্য যার প্রমাণ নতুন নিয়মে যথেষ্ট রয়েছে।

২২০৫ খ্রীষ্টীয় পরিবার হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির মিলন-সমাজ – পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার মিলনের প্রতিমূর্তি এবং চিহ্ন। সন্তান প্রজনন এবং শিক্ষাদান পিতার সৃষ্টিকাজকেই প্রতিফলিত করে এবং প্রার্থনা ও খ্রীষ্টের বলিদানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। দৈনিক প্রার্থনা এবং ঐশবাণীপাঠ পরিবারকে ভালবাসায় শক্তিশালী করে তোলে। মঙ্গলবাণী ঘোষণা এবং মিশনারী কাজে খ্রীষ্টীয় পরিবারের বিশেষ দায়িত্ব আছে।

২২০৬ পারিবারিক সম্পর্ক, সর্বোপরি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ, স্নেহ-মমতা এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে দেয়। পরিবার হচ্ছে একটি *'সম্মনিত সমাজ'* যেখানে "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিন্তা-চেতনার সহভাগিতা ও আলাপ-আলোচনা এবং পিতামাতা হিসেবে সন্তানদের লালন-পালনের ব্যাপারে সাগ্রহ সহযোগিতা" করা সম্ভব।

(খ) পরিবার ও সমাজ

২২০৭ পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের মৌলিক কোষ। এই প্রাকৃতিক সমাজেই স্বামী-স্ত্রী নিজেদের পরস্পরের কাছে ভালবাসা এবং জীবনের উপহার হিসেবে দানকরার জন্য আহূত। পরিবারের মধ্যে অধিকার, স্থিতিশীলতা এবং সুসম্পর্কের জীবই সমাজে স্বাধীনতা, নিবাপত্তা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিসরূপ। পরিবার হচ্ছে সেই সমাজ যেখানে শৈশবকাল থেকেই মানবসন্তান প্রয়োজনীয় নৈতিক মূল্যবোধ, ঈশ্বরের প্রতি সম্মান এবং স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার শিখতে পারে। পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজজীবনে প্রবেশের দীক্ষা।

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

সাধারণকালের দ্বাদশ রবিবার

১ম পাঠ: যিরমিয় ২০:১০-১৩

২য় পাঠ: রোমীয় ৫:১২-১৫

মঙ্গলসমাচার মথি ১০:২৬-৩৩

মূলকথা: 'ভয় করো না; ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গেই আছেন'

ভয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কম বেশি আছে। ভয় একটি স্বাভাবিক আত্মগত মানসিক অবস্থা, যা আমাদের দেহ মনকে অকস্মাৎ আলোড়িত ও আতঙ্কিত করে ফেলে, আমরা ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে যাই। কি করতে হবে সেই বোধ চলে যায় এবং প্রায়শঃ আমরা ভুল করি বা ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাই। সাধারণত কোন বিপদ, হুমকি কিংবা অজানা পরিস্থিতির আশঙ্কায় মনের মধ্যে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হয় মূলত তাই হল ভয়। মানুষ যখন কোন বিপদের আশঙ্কা করে, তখন আমাদের মস্তিষ্ক একটি বিপদ সংকেত পাঠায় এবং শরীরকে বিপদ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। তখন সর্ব শরীরে সেই ভয়ের অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

আমরা নানাবিধ চিন্তা করে ভয় পাই, আর তা বেশির ভাগই বিপদের আশঙ্কা করে। অথবা অতীতের কোন অভিজ্ঞতা আমাদের ভয়ের কারণ হতে পারে। ভয়ের কিছু স্বাভাবিক কারণ যেমন কোন হিংস্র প্রাণী, আগুন, পানি ইত্যাদি। এক একজন আবার এক এক বিষয় বেশি ভীত হয়, যেমন কেউ অন্ধকারে ভয় পায়, কেউ উচ্চতা, কেউ একাকীত্বকে ভয় পায়। ভয়ের আরো নানাবিধ কারণ থাকতে পারে।

ভয় আমাদের নানা কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে, ভয় পেলে আমরা স্থান ত্যাগ করি, চিৎকার করি, কাজ ফেলে চলে যাই এবং বিভ্রান্ত হয়ে অন্য মানুষের সহায়তা কামনা করি। চিৎকার বা স্থান ত্যাগ করে আমরা সকল ভয় জয় করতে পারি না। আমরা কারও উপর নির্ভর করেও ভয় থেকে সব সময় বিমুক্ত হতে পারি না। ভয়কে জয় করার জন্য আমাদের প্রয়োজন আত্মিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ আবেগের বিষয় আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু কথা বলেন। ভয়ের মাঝে তিনি আমাদের অভয় দেন, তিনি নিজেই অভয় হয়ে আসেন। তিনি তিন তিন বার বলেন, "তোমরা ভয় করো না।" যিশু ভালভাবেই জানেন আমাদের ভয় পাওয়ার আশংকা আছে, আমরা ভয়ে ভীত হয়ে ভুল করতে পারি এবং দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেতে পারি। তাই তিনি আমাদের বলেন তোমরা ভয় পেয়ো না। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বসবাস করি যেখানে নানাধরনের ভয় আমাদের ঘিরে থাকে। আমরা নানা ভয়, দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকি। আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা, ভয় ও সন্দেহের দোলায় দুল্যমান থাকি। আমাদের ভয় আছে অসুস্থতা নিয়ে, ভয় আছে ব্যর্থতার, মানুষের সমালোচনা, বিশ্বাস হারানোর ভয়, নানাজনের নানা বিরোধিতার ভয়।

যিশু জানতেন তাঁর শিষ্যদের মঙ্গলবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে বিরোধিতা, অপমান এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হতে পবে। ভয় পেয়ে তারা এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে। তাই তাদের সাহসের নিশ্চিত প্রয়োজন। তাই তিনি তাঁদের সাহস দিয়ে বলেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না,' তিনি তাদের আত্মিকভাবে নিশ্চয়তা দান করেন এবং বৈষয়িক বিষয়াদির চেয়ে যে আত্মিক বিষয় বেশি জরুরী সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "যারা দেহকে হত্যা করতে পারে কিন্তু আত্মাকে হত্যা করতে পারে না, তাদের ভয় করো না।" আমাদের এই জীবন মূল্যবান, কিন্তু স্বর্গীয় জীবনই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই দেহের মায়ায় আমরা যেন আত্মাকে না হারাই।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা অমূল্য- যিশু একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, '..চড়ুই পাখি কি দু'পয়সায় বিক্রি হয় না?' তার মানে একটি সাধারণ ছোট পাখিও ঈশ্বরের নজরের বাইরে নয়। আর আমাদের তো তিনি ভালোবেসে আপন স্বরূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাদের প্রতি তিনি কতো না যত্নশীল। তাই তিনি বলেন, 'তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও তাঁর জানা আছে।' এর অর্থ হলো ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে সব জানেন। আমাদের আনন্দ, দুঃখ, সংগ্রাম, অশ্রু কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। অনেক সময় আমরা মনে করি আমরা একা, কেউ আমাদের বোঝে না। ঈশ্বর আমাদের দুঃখ, কষ্ট, ভয়, আতঙ্কের মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ঈশ্বর আমাদের খুব কাছ থেকে দেখেন এবং ভালোবাসেন। তিনি আমাদের প্রতি যত্নশীল এবং যত্ন নেন। তাই যিশু আমাদের আশ্বস্থ করে বলেন, তোমরা তো চড়ুই পাখীর থেকেও অনেক বেশী মূল্যবান। তার মানে সামান্য চড়ুই পাখির খাবারে চিন্তা যিনি করেন তিনি আমাদের সকল প্রয়োজনের বিষয়ই সচেতন। তাই আমরা যেন নির্ভয়ে তাঁর কাজ করে যাই।

যিশু কেন আমাদের বলেন, তোমরা ভয় করো না। কারণ তিনি আমাদের তাঁর নির্ভিক বাণীদূত হতে আহ্বান করেছেন। ভীত মানুষ বাণী প্রচারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে পারে না। যিশু আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে সাহসী হই। এই জগতে আমরা যদি, যে কোন ভয় ও প্রলোভনের ছায়া মাড়িয়ে বাণী প্রচারের কাজে সক্রিয় থাকি তাহলে তিনি আমাদের ঐশরাজ্যে তার জন্য পুরস্কার দেবেন, যার নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি বলেন, 'যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব।' একজন খ্রিস্টান বা খ্রিস্টভক্তের পরিচয় শুধু গির্জায় প্রার্থনা করা আর কিছু খ্রিস্টীয় রীতি নীতি মেনে চলা নয়; বরং জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে যিশুর সাক্ষ্য বহন করা। আমাদের কথায় কাজে, সততায়, ক্ষমা-ভালোবাসায়, আমাদের সেবা কাজের মধ্য দিয়ে যিশুকে প্রকাশ করা হলো প্রকৃত খ্রিস্টান হয়ে উঠা। বর্তমান সময়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ্য নিয়ে কাজ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু একজন খ্রিস্টানের আহ্বান হলো সাহসের সঙ্গে খ্রিস্টকে অনুসরণ করা। আর যিশুর আদর্শ অনুসরণ করতে গেলে আমরা সব সময় মানুষের পছন্দ মতো বা মনযোগীয়ে কাজ করতে পার না। মানুষের বিরোধীতার মাঝে খ্রিস্টীয়মূল্যবোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ভয় পেলে চলবে না। সেখানে মাথা উঁচু করে সাহস নিয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করে, বিরোধীতার মুখেও কাজ করতে গেলে নির্ভিক হতে হবে। তাই যিশু আমাদের সাহস না হারিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে বলেন।

আমরা তখনই নির্ভিক হতে পারব, যখন আমরা ঈশ্বরের উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে প্রবক্তা যিরমিয়'র বাণী আমাদের আশ্বস্ত করে। প্রথম পাঠে আমরা যেমনটি দেখি প্রবক্তা যিরমিয় প্রচণ্ড বিরোধিতার, শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েও ভেঙ্গে পড়েননি। বরং তিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা নিয়ে বলেছেন- "প্রভু আমার সঙ্গে আছেন এক পরাক্রমশালী যোদ্ধার মতো"। প্রবক্তা যিরমিয় এই কথা বলতে পেরেছিলেন কেননা তিনি নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেননি, তিনি ভরসা করেছেন ঈশ্বরের উপর। তিনি নির্দ্বিধায় এগিয়ে গেছেন। আমরাও যখন সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন হতাশ না হয়ে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে যেন শিখি। প্রবক্তা যিরমিয় আমাদের জন্য যেন সেই বার্তাই রেখেছেন।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে পাপ পৃথিবীতে মৃত্যু ও দুর্ভোগ এনেছিল। কিন্তু ঈশ্বর খ্রিস্টের মাধ্যমে আমাদের জন্য অনুগ্রহ দিয়েছেন, তিনি আমাদের ক্ষমা করে নতুন জীবন দান করেছেন। সেই খ্রিস্টই আমাদের হতাশ না হয়ে, ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতে বলছেন। মানুষ একদিকে প্রলোভিত ও অন্য দিকে ভয় নিয়ে যখন জীবন যাপন করে তখন ঈশ্বর ভীরুতা থেকে দূরে সরে যায় এবং পাপে পতিত হয়। পাপ আমাদের জীবনে আসবেই। আমরা যেন খ্রিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে অনুতাপ করতে ও তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে ভয় না করি। তাই আসুন ভয়কে জয় করি, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি আর খ্রিস্টের বাণী জীবনে ধারণ করে এগিয়ে চলি। আমরা হয়ে উঠি ঈশ্বরের নির্ভিক ও বিশ্বস্ত সেনা, সাহসী বাণী প্রচারক ও অকুতোভয় সৈনিক।

বিশ্ব বাবা দিবস: সকল বাবাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা

নিকোলাস বিশ্বাস

প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী বাবা দিবস পালিত হয়। ঠিক একইভাবে এবছরও ২১ জুন বিশ্ব বাবা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই দিনটি পৃথিবীর সকল বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি বিশেষ উপলক্ষ্য। একজন বাবা শুধু পরিবারের উপার্জনকারী নন, তিনি সন্তানের প্রথম শিক্ষক, পরামর্শদাতা, অভিভাবক এবং জীবনের পথপ্রদর্শক। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পেছনে একজন বাবার অবদান অপরিসীম। তাই বাবার ত্যাগ, পরিশ্রম ও ভালোবাসাকে স্মরণ করার জন্য বিশ্ব বাবা দিবসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

মানবজীবনে বাবার ভূমিকা অনন্য। একজন শিশু জন্মের পর থেকেই বাবার স্নেহ, মমতা ও সুরক্ষার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে। বাবা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। তিনি সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। অনেক সময় একজন বাবা নিজের কষ্ট ও ত্যাগের কথা প্রকাশ করেন না, কিন্তু পরিবারের সুখ-শান্তি ও সন্তানের কল্যাণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যান। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফলেই পরিবার নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে।

বাবা দিবসের ইতিহাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে এই দিবস পালনের ধারণার সূচনা হয়। এর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সোনোরা স্মার্ট ডড (Sonora Smart Dodd) নামের এক নারী। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি গির্জায় মা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে মায়েদের অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে - যেসব বাবা তাঁদের সন্তানদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং আত্মত্যাগ করেন, তাঁদের সম্মান জানানোর জন্যও তো একটি বিশেষ দিন থাকা উচিত।

সোনোরা তাঁর নিজের বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন স্মার্টের জীবন থেকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উইলিয়াম স্মার্ট ছিলেন গৃহযুদ্ধের (American Civil War) অভিজ্ঞ সৈনিক। তাঁর স্ত্রী ষষ্ঠ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি একাই তাঁর ছয় সন্তানকে লালন-পালন ও শিক্ষিত করে তোলেন। একজন একক অভিভাবক হিসেবে তিনি যে দায়িত্বশীলতা, ত্যাগ ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সোনোরার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাই তিনি তাঁর বাবার মতো সকল বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি বিশেষ দিবস চালুর উদ্যোগ নেন। সোনোরার প্রচেষ্টার ফলে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের স্পোকেন শহরে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে বাবা দিবস পালিত হয়। ধীরে ধীরে দিবসটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে।

বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং হৃদয়স্পর্শী। অনেক সময় বাবারা মায়ের মতো আবেগ প্রকাশ করেন না, কিন্তু তাঁদের ভালোবাসা কোনো অংশে কম নয়। একজন বাবা সন্তানের সাফল্যে গর্ববোধ করেন এবং ব্যর্থতার সময় সাহস জোগান। তিনি জীবনের কঠিন সময়ে শক্ত ভিত্তির মতো পাশে দাঁড়ান। সন্তানের ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়া পূরণ করার জন্য তিনি নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে বিসর্জন দেন। একজন বাবার এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মূল্য কখনোই সম্পূর্ণরূপে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

বিশ্ব বাবা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বাবার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দিনে সন্তানরা বিভিন্নভাবে তাদের বাবাকে সম্মান জানায়। কেউ উপহার দেয়, কেউ শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করে, কেউ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায়, আবার কেউ সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে বাবার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাবা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে বাবার অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও আধুনিকতার প্রভাবে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যস্ত জীবনযাত্রা, কর্মক্ষেত্রের চাপ এবং বিভিন্ন সামাজিক কারণে অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। এ পরিস্থিতিতে বাবা দিবস আমাদের পরিবারকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; বরং পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার একটি মূল্যবান উপলক্ষ্য। এই দিনটি আমাদের শেখায় যে, বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমেও প্রকাশ করা উচিত। বাবা দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য কেবল উপহার দেওয়া বা আনুষ্ঠানিকতা পালন নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাবার অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। একজন সন্তানের উচিত বাবার পরামর্শ মেনে চলা, তাঁর সম্মান রক্ষা করা এবং বার্ধক্যে তাঁর যত্ন নেওয়া। কারণ শৈশবে যিনি সন্তানের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পাশে দাঁড়ানো সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব বাবা দিবস তুলনামূলকভাবে নতুন একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদযাপন। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক দিবস নয়; বরং পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে। বাংলাদেশে বাবা দিবসের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বা সরকারি ঘোষণা নেই। মূলত: ১৯৯০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে এবং বিশেষ করে ২০০০ -এর দশকে গণমাধ্যম, স্যাটেলাইট টিভি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে দিবসটি পরিচিত হতে শুরু করে। শহরকেন্দ্রিক পরিবার ও তরুণদের মধ্যে প্রথমে এর প্রচলন বাড়ে। বর্তমানে স্কুল, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, করপোরেট সেক্টর ও পরিবার পর্যায়ে বাবাকে সম্মান জানিয়ে শুভেচ্ছা, অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। বাংলাদেশে বাবা দিবস সাধারণত উপহারকেন্দ্রিক উৎসবের চেয়ে পারিবারিক সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও সম্পর্কের প্রকাশ হিসেবে বেশি দেখা হয়। অনেক পরিবারে বাবার সঙ্গে সময় কাটানো, শুভেচ্ছা জানানো বা দোয়া করার মধ্য দিয়েই দিনটি পালন করা হয়।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও বাবার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে পরিবারব্যবস্থা এখনো পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন বাবা পরিবারের প্রধান অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের শিক্ষাদান, নৈতিক উন্নয়ন

(বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

বাবাই আমাদের প্রথম পরিচয়

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

বাবা মানে সাহস, আসলে বাস্তব
হাসি খুশির জীবনে, বাবাই আমার রক্ষক
বাবাই আমার সম্পদ, সব সংগ্রামের স্রষ্টা
বাবার থেকেই তৈরি, আমার জীবনের পৃষ্ঠা।।

পৃথিবীর সবচেয়ে আস্থাশীল, সাহসী, পরম নির্ভরশীল আর একদম কাছের ব্যক্তি হচ্ছেন 'বাবা'। যিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে কোনো স্বার্থের চিন্তা না করেই নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যান। বাবার জন্যই আমরা সবাই এ পৃথিবীতে এসেছি। এই জগত সংসারে বাবাই হচ্ছেন আমার আপনার প্রথম পরিচয়। বাবা হলেন সন্তানের জনক, ধারক ও বাহক সর্বোপরি পরম আশ্রয়। বাবা হলেন একটি গাছের মূল বা শিকড় আর তার স্ত্রী-সন্তানেরা হলো গাছ ও শাখা-প্রশাখা। যিনি স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেন। নিজের বর্তমানকে ভুলে গিয়ে হাসি মুখে পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সত্যিই বাবা হলেন পরিবারের উত্তম কর্তা ও শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব, সন্তানদের পরম আশ্রয় ও অকৃত্রিম বন্ধু। বাবা ও সন্তানদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাবা ও সন্তানের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে একজন পিতার ভূমিকা অপরিসীম। আর এই সুমধুর সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই যিশু বলেছেন, "আমি ও আমার পিতা আমরা এক" *(যোহন ১৭:১১)*।

পরিবারে শিশুর জন্মগ্রহণই যেন পিতৃত্বের পূর্ণতা পায়। আর সেই শিশু তার বাবা ও মায়ের সমান জিনগত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে পরিবারে বেড়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। পরিবারের কর্তা হিসেবে সন্তানদের জীবনে পিতার ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। কারণ মানবিক গঠনের ক্ষেত্রে শিশুর জন্য যেমন মায়ের মমতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, তেমনিভাবে বাবার কঠোর শাসন ও দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। বাবাই সন্তানদের শারীরিক ও আবেগময় দিকগুলো শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কেননা "বাবা হচ্ছেন এমনি একজন ব্যক্তি যিনি সন্তানদেরকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে তুলেন।" মনোবিজ্ঞানে 'পিতৃ ক্ষুধা' বলে একটি তত্ত্ব রয়েছে। তত্ত্বটির মূল কথা হলো, পিতার অনুপস্থিতি শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাবারা বংশপরাক্রমায় মানব জীবনে রক্তপ্রবাহের ধারায় সন্তানদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের রূপান্তর ঘটিয়ে তারই অংশ হয়ে আছে। তাই সন্তানদের গঠন জীবনে পিতার আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, শাসন ও উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সন্তানদের মনে রাখতে হবে যে, পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে উঠতে মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকারও গুরুত্ব রয়েছে।

প্রতিটি সন্তানের কাছে বাবা মানেই শক্ত ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব। বাবা মানে কঠিন চেহারা। বাবা মানেই শক্ত চোয়ালে। কিন্তু বাবাদের এই বিশেষ গুণগুলো যেমন রয়েছে, তেমনি বাবার মধ্যে কোমল ও নরম প্রকৃতির মনুষ্যত্বও

রয়েছে। সন্তানদের জন্য প্রত্যেকটি বাবারই Soft Corner কাজ করে। কেননা প্রতিটি বাবারই নরম ও কোমল হৃদয় রয়েছে। পিতারা যেহেতু পরম সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি তাই তাদের মধ্যে ভালোবাসাময় একটি হৃদয় রয়েছে। সেই হৃদয়ে সকল সন্তানেরা নিরাপদে ও পরম ভরসার আশ্রয় পায়। লেখক হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, "পৃথিবীতে অনেক খারাপ মানুষ আছে, কিন্তু খারাপ বাবা একটাও নেই।" বাবা মানে সাহস। বাবা মানেই পথ চলার অনুপ্রেরণা। বাবারা প্রতিটি সন্তানকে স্নেহ ও ভালবাসেন ঠিকই কিন্তু আমরা সন্তানেরা তা অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বুঝতে পারি। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির খুবই প্রয়োজন। কেননা বাবাই পরিবারের রক্ষক ও কর্ণধার। পরিবারে বাবার উপস্থিতি যেন সৃষ্টিকর্তারই উপস্থিতি।

বাবা হওয়ার একটি আহ্বান আমাদের সবার। অন্যদিকে বাবা মানেই আনন্দ, বাবা মানেই আদর্শ। বাবাই সন্তানদের অকৃত্রিম বন্ধু। বাবা হচ্ছে আমাদের জীবনে বিশাল বটবৃক্ষ। যিনি ঝুম বৃষ্টিতে ও তীব্র রোদে আমাদের আগলে রাখেন। রক্ষা করেন সকল বিপদ ও মন্দতার হাত থেকে। অন্যদিকে বাবা হলেন একটি বাড়ির ছাদ, যে নিজে পুড়ে সন্তানদের ছায়া দেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন না। বাবার সেই শীতল বাহুদ্বয়ের আশ্রয়ে সন্তানেরা নিরাপদে ও পরম ভরসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আর বাবা তার অকৃত্রিম ভালবাসায় সন্তানদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলেন। সত্যিই বাবার উপস্থিতি যেন আমাদের জীবনে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আর এই জন্যই বাবা নিজের দেহের রক্ত পানি করে সন্তানকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করে থাকেন। তিনি সন্তানদের পিতৃত্বের ভালোবাসায় সবসময় আবিষ্ট করে রাখেন।

'বাবা' আমাদের পরিবারের মস্তক স্বরূপ। মস্তক ছাড়া শরীর যেমন মূল্যহীন, অকেজো ও ভারসাম্যহীন ঠিক তেমনি বাবা ছাড়া আমাদের পরিবারও ভারসাম্যহীন হয়ে পরে। এই বাস্তব দৃশ্য আমাদের সমাজে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। একমাত্র বাবাই নিজের সুখ ও আরাম-আয়েশ বির্সজন দিয়ে সন্তানদের প্রতিষ্ঠায় ও পরিবার রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যান। তিনি নিজের জীবন দিয়ে সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যাতে করে সন্তানেরা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে। সত্যিই আমাদের জীবনে বাবার ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রত্যকজন সন্তানের কাছে বাবা হলেন জীবন যুদ্ধের সত্যিকার নায়ক। সন্তানের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশেষ ব্যক্তি। যিনি পরিবারের কর্তব্য পালনের মধ্যেও সন্তানের স্নেহ ও যত্ন নিতে কার্পণ্য করেন না। আমাদের যত অভাব-অভিযোগ, সুখ-আহ্লাদ বেশির ভাগই বাবা পূরণ করে থাকেন। যদিও বাবাদের সবকিছুর মধ্যে একটা সীমিত মাত্রা দেওয়া থাকে তবুও তাদের প্রতি আমাদের ভীতি মেশানো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কিন্তু কম নয়। কেননা বাবাই আমাদের জীবনে প্রধান পরিচয় এবং শর্তহীন ও নিস্বার্থ ভালোবাসার আশ্রয়। বাবাই হলেন জীবনের অনুপ্রেরণা। তিনি ছেলের কাছে একদিকে যেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, দক্ষ কারিগর ও জীবন যুদ্ধের নায়ক অন্যদিকে একজন মেয়ের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও

জীবনের রাজা। বাবাই সন্তানদের comfort zone. একমাত্র বাবার রাজ্যেই তার সন্তানেরা শক্তিশালী, সংগ্রামী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। পরিবারে বাবাই যেন সন্তানের পথ প্রদর্শক। তাঁর শক্ত হস্ত ধরে সন্তানেরা পৃথিবীটাকে চিনতে ও জানতে এবং বাস্তবতাকে বুঝতে শেখে। বাবাই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি শাসন করেন আবার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই রবি ঠাকুর বলেছেন, "শাসন করে সেই, যে তোমাকে ভালোবাসে।" এই জন্য বাবা হলো আমার আপনার প্রকৃত ভালোবাসার উৎস। তাই বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করাই সন্তানের প্রধান দায়িত্ব।

আমাদের জন্মসুতোয় গাঁথা বৃক্ষসম সম্পর্কের নাম বাবা। বাবাই আমাদের প্রথম পরিচয়। আসলে বাবা বাবা-ই। বাবার নির্যাস শুধু বাবাই। এজন্য একজন বাবা সূর্যের মত গরম হলেও তিনি না থাকলে চারিপাশে অন্ধকার হয়ে যায়। তাই তো বলা হয়, সন্তানের গঠনের জন্য প্রয়োজন মায়ের মমতা এবং বাবার দক্ষতা। শুধু যে আমাদের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা কিন্তু নয় বরং আমরা যারা সন্তানেরা রয়েছি আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করা ও তাদের প্রয়োজনে সর্বদা পাশে থাকা। তারা যেন কোনোভাবেই আমাদের আচার-ব্যবহার দ্বারা কষ্ট না পায়। পবিত্র বাইবেলে বেনসিরার গ্রন্থে লেখা রয়েছে, "তোমরা কথায়-কাজে তোমার পিতাকে সম্মান কর, যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে *(বেনসিরা ২:৮)*।" পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, "পিতা-মাতার সঙ্গে এমন আচরণ করো না যাতে তারা কষ্ট পান; তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং সর্বদা সম্মানের সঙ্গে কথা বলো।" অন্যদিকে পবিত্র গীতায় বলা হয়েছে, "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহী পরমং তপঃ, পিতরী প্রিতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা," সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই মন্ত্র জপে বাবাকে স্বজ্ঞান করে শ্রদ্ধা করে থাকে। যেখানে পবিত্র গ্রন্থগুলো আমাদের বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল হতে নির্দেশনা দিয়েছে। যেখানে আমার-আপনার জীবনে বাবার এত সীমাহীন ভূমিকা রয়েছে, সেখানে কিভাবে আমরা আমাদের পিতা-মাতাদের সাথে দুর্ব্যবহার করি, তাদেরকে অযত্নে ও অবহেলায় রাখি এমনকি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসি? বর্তমান পরিবারগুলোতে প্রতিনিয়ত তাই ঘটছে। পিতা-মাতাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো যেন এখন আমাদের সংস্কৃতি হয়ে গেছে। এতে করে আমরা আমাদের হীন ও বিকৃত মন মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছি। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, পিতা-মাতারা হচ্ছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা মানেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। অন্যদিকে, পিতা-মাতার সাথে সন্তানের শুধু বস্তুগত জিনিসের জন্য সম্পর্ক নয় যে বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে, তাদের খোঁজ-খবর না নিয়ে অন্যের কাছে বলে বেড়াবে যে আমার পিতা-মাতা দুধে ভাতে আছে বরং পিতা-মাতার আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। দিন দিন কেন জানি আমরা আত্মকেন্দ্রিক ও ভণ্ড হয়ে যাচ্ছি। আমরা সন্তানেরা অর্ধাঙ্গিনীর সাথে মিশে গিয়ে এদিকে যেমন এক হয়ে উঠছি, অন্যদিকে আমরা আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয়কে ভুলে যাচ্ছি। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি আমাদের মূল বা শিকড় থেকে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, "When we are rootless, we become fruitless." তাই আমরা প্রত্যেকজন সন্তানেরা যেন বাবার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করি। কারণ আমরাও একদিন না একদিন বাবা হবো। এখন যে মাপকাঠিতে তাদেরকে মেপে দিচ্ছি, সময় মতো আমাদেরও সেই মাপ কাঠিতে সমান ভাবে মাপা হবে। তাই আমরা যেন বাবার প্রতি সচেতন হই এবং তাঁর ভালোবাসা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। কারণ তিনি আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে রয়েছেন।

তাই এই বাবা দিবসে অঙ্গীকার করি, সন্তান হিসেবে বাবার উপর আমাদের প্রত্যেকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে পারি। কেননা সৃষ্টিকর্তা তাদের মধ্য দিয়ে আমাদের এই জগতে পাঠিয়েছেন। আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি যে পিতা-মাতার জন্যই আজকের এই আমি। তাই আমরা যেন বাবাদের নিয়ে একটু সচেতন ভাবে চিন্তা করি এবং তাদের ভালবাসাকে উপলব্ধি করি। কারণ বাবারা সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে রয়েছেন। আমরা যেন তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান ও নিঃস্বার্থভাবে সেবা করি। এতেই তারা খুশি হবেন এবং সুখীও হবেন। সন্তান হিসেবে এটাই আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. মঙ্গলবার্তা বাইবেল- খ্রীষ্টিয়াঁ মিংঙো. ইস. জে. (পবিত্র বাইবেল)।

২. গমেজ ডানিয়েল দুলেন্দ্র, বাবা: পরম ভরসার আশ্রয়, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-২২, ২০২৪, পৃষ্ঠা-১২।

৩. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-২২, ২০১৮ এবং ২০২০।

৪. https://www.prothomalo.com.

(৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্রাম কিংবা শহর - সবখানেই বাবারা তাঁদের পরিবারের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী কিংবা চাকরিজীবী - যে পেশাতেই থাকুন না কেন, একজন বাবা তাঁর পরিবারের কল্যাণকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন।

আমার বাবা তুফান বিশ্বাস (১৯২৮-২০২১) -এর স্নেহময় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। গত ৩ জুন আমার প্রিয় বাবা তুফান বিশ্বাসের (৯৩) প্রয়াণের ৫ম বার্ষিকী ছিল। পাচঁটি বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁর ভালোবাসা, প্রজ্ঞা, দয়া ও দিকনির্দেশনা আজও আমাদের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে। তিনি আমাদের জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছেন, যে মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছেন এবং পরিবারের প্রতি যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি। তাঁর জীবন ছিল আমাদের জন্য এক আশীর্বাদ, তাঁর স্মৃতি এক অমূল্য সম্পদ। তিনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বেঁচে থাকবেন। এই বিশেষ দিনে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁকে অনন্ত শান্তি দান করেন এবং তাঁর স্নেহময় আশ্রয়ে স্থান দেন। আমরা তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করি এবং তাঁর সঙ্গে কাটানো অগণিত স্মৃতিকে সযত্নে হৃদয়ে লালন করি।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব বাবা দিবস মানবসমাজে বাবাদের অসামান্য অবদানকে স্মরণ ও সম্মান জানানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। একজন বাবা পরিবারের শক্তি, সাহস ও আশ্রয়ের প্রতীক। তাঁর ভালোবাসা, ত্যাগ এবং পরিশ্রমের কারণেই সন্তানের জীবন সুন্দর ও সফল হয়ে ওঠে। তাই ২১ জুন ২০২৬ বিশ্ব বাবা দিবস উপলক্ষে আমরা সকল বাবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আসুন, আমরা শুধু এই একটি দিন নয়, বছরের প্রতিটি দিন বাবাদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করি এবং তাঁদের অবদানকে যথাযথ মর্যাদা দিই।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ছায়াতেই আমাদের আশ্রয়

লিনা মেরি রোজারিও

যাদের বাবা নেই তারাই বুঝে বাবা আসলে কে ও কি জিনিস। আমার বাবা আছে মানে আমি কোটিপতি! হ্যাঁ আমার আশ্রয় আমার মা আর ছায়া আমার বাবা।

যে কথা বাবা আমাদের বলতো, আমিতো আছি! তুমি কি কখনো বাবাকে বলতে শুনেছ, "আমার সবাই আছে, কিন্তু আমি একা..!" এই কথাটা যদি কোনো অসুস্থ বাবা কিংবা মায়ের হয়, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার শব্দ এটাই।

সন্তান বাবার কাছে অবহেলা পেলে মায়ের বুকে আশ্রয় খুঁজে নেয়। আবার মায়ের কাছে কষ্ট পেলে বাবার কাছে বায়না করে। কিন্তু একজন বাবা-মা যদি সন্তানের কাছ থেকেই অবহেলা পায়, তাহলে তাদের জীবনের চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু নেই।

কারণ সন্তান শুধু মায়ের গর্ভে জন্ম নেয় না এমনকি শুধু বাবার উপার্জনেও বড় হয় না; সে জন্ম নেয় দু'জন মানুষের ভালোবাসা, ত্যাগ আর সংগ্রামে।

মা কেন আপন হবে, বাবা কেন নয়?

মা যদি সন্তানের জন্য রাত জেগে থাকে, তাহলে বাবা দিনের পর দিন নিজের শরীর ভেঙে রোজগার করে। মা মুখে খাবার তুলে দেয়, আর বাবা সেই খাবার জোগাড় করতে ঘাম ঝরায়। আমি ছোটবেলায় দেখেছি, আমার বাবা জ্বর নিয়েও অন্যের জমিতে কাজ করতে যেত। দিনশেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরতো, কখনো সন্ধ্যায়, কখনো গভীর রাতে। আমরা অসুস্থ হলে ধার করে ডাক্তার দেখাত, কিন্তু নিজের অসুস্থতায় কখনো ওষুধ কিনতো না। যখন বাবা ঢাকা বাবুর্চি কাজ করতেন, মাসে ৩/৪ দিন ছুটি পেতেন। ঈদের ছুটিতে বাবা কোন কারণ ছাড়াই তাঁর বিভিন্ন বন্ধু বা সহকর্মীদের কাছ থেকে গরুর মাংস চেয়ে নিজে নিয়ে আসতেন আর ছুটি না পেলে কাউকে দিয়ে বাড়িতে পাঠাতেন। প্রতিটি পরিবারের বাবারা এমনই হয়। নিজের সন্তানের জন্য অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে দূরে থেকে উপার্জন করে যেন তার পরিবারটা ভাল থাকে, একটু ভাল খায়। অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে বাড়িতে, নতুন পোশাক পড়েছি, না চাইতে পেয়েছি। কিন্তু কখনো দেখিনি সে মানুষটা নিজের জন্য কিছু কিনেছে।

আর মা? নিজের কষ্ট লুকিয়ে আমাদের আগলে রাখতো। নিজে না খেয়ে হলেও সন্তানকে খাইয়ে দিত। আজ বাবা অসুস্থ। গায়ে শক্তি নেই, কাজ করার সামর্থ্য নেই। আজ আমি বড় হয়েছি, উপার্জন করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সন্তান হিসেবে আমি কি সত্যিই তাদের প্রাপ্যটা ফিরিয়ে দিতে পারছি? বর্তমানে অনেক সন্তান আছে, যারা শুধু একজনের কথায় আরেকজনকে ঘৃণা করে। কিন্তু একবারও ভাবেনা, বাবার কষ্ট ছাড়া সংসার চলতো না, আর মায়ের মমতা ছাড়া জীবন সুন্দর হতো না।

বাবা-মা দুজন কখনো আলাদা নয়। একজন ছায়া, আরেকজন আশ্রয়। একজন জীবন গড়ার শক্তি, আরেকজন সেই জীবনের শান্তি। তাই বাবা-মাকে আলাদা করে ভালোবাসা যায় না। যে সন্তান মাকে সম্মান

করে কিন্তু বাবাকে ঘৃণা করে, অথবা বাবাকে ভালোবেসে মাকে অবহেলা করে–সে আসলে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থই বুঝেনি।

কারণ, 'মা' শব্দে মমতা আছে, আর 'বাবা' শব্দে নিরাপত্তা। দুটো মিলেই একটা পূর্ণ পরিবার।

এখন প্রশ্ন হলো, আমার ভিতরে আসলে কি চলছে? আমি কি সত্যিই একজন ভালো সন্তান হতে পেরেছি? আমি কি সত্যি বাবাকে ভালোবাসি? আমি কি মায়ের দেওয়া শিক্ষাগুলো হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছি? নাকি আমি শুধু বড় হয়েছি, কিন্তু মানুষ হতে পারিনি? আজ যদি আমি নিজেকে সঠিক পথে আনতে না পারি, তাহলে আমার জন্মটাই হয়তো বৃথা। কারণ মানুষ শুধু পৃথিবীতে আসার জন্য জন্মায় না, মানুষ জন্মায় নিজের পরিবার, নিজের মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

আমি আজ আমার পরিবারের ভাঙনের একজন নীরব সাক্ষী। চোখের সামনে সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে, অথচ আমি চুপ। না পারছি কাউকে জোড়া লাগাতে, না পারছি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কখনো কখনো মনে হয়, আমি হয়তো আমার মা-বাবার জীবনের সবচেয়ে ব্যর্থ সন্তান।

যাদের স্বপ্ন ছিল আমাকে মানুষ বানাবে, আজ সেই আমিই তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তবুও ভিতরের কোথাও একটা আশা বেঁচে আছে, হয়তো এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো এখনো আমি বদলাতে পারি। হয়তো একদিন বাবা-মায়ের চোখে আবার সেই গর্ব দেখতে পারবো।

কারণ একজন ভালো সন্তান জন্মগতভাবে তৈরি হয় না, সে তৈরি হয় নিজের ভুল বুঝে ফিরে আসার মাধ্যমে।

আজই যাও, খুঁজে নাও সেই বাবাকে– যে সারাজীবন তোমার জন্য ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, নিজের কষ্ট লুকিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ গড়েছে। খুঁজে নাও সেই মানুষটাকে, যার রাগের আড়ালেও ছিল নিঃশব্দ ভালোবাসা, যার ক্লান্ত শরীরেও ছিল তোমার জন্য বেঁচে থাকার শক্তি। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরো তাকে। একবার অন্তত বলো, "I love you, Baba."

বিশ্বাস করো, এই ছোট্ট কথাটার জন্য হয়তো মানুষটা বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে। আর মায়ের কাছে গিয়ে বলো–"মা, এসো...আবার নতুন করে সব শুরু করি। পুরোনো কষ্টগুলো আজ এখানেই শেষ হোক। কারণ আমি আছি তোমাদের পাশে।" কেউই কখনো নিখুঁত মানুষ হয় না। আর মা-বাবা হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আরেকটা নাম। তারা বেঁচে থাকতে তাদের মূল্য দাও। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কান্না করার চেয়ে, জীবিত অবস্থায় একবার ভালোবেসে ডাকাটা অনেক বেশি সুন্দর।

গাজীপুর জেলাধীন কালীগঞ্জ উপজেলার বান্দাখোলা মৌজায় জমিসহ বাড়ী বিক্রি হবে।

জমির পরিমান: ৫ কাঠা (১,৪০০ স্কয়ার ফিট) বড় ডাইনিং স্পেস, ৩ বেড (একটি এটাচড বাথরুম, একটি কমন বাথরুম) একটি কিচেন, ২টি বেলকোনী ২ তলা ফাউন্ডেশনসহ বাড়ী বিক্রি হবে।

যোগাযোগ: +৮৮ ০১৬১৫-১৯৯০৪৯

(শুধুমাত্র প্রকৃত খ্রিস্টান/হিন্দু ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন)

বিজ্ঞ/১২৯/২৬

যিশুর হৃদয়: শান্তিময় আশ্রয় কেন্দ্র

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

আজকের পৃথিবী অভূতপূর্ব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে বটে, কিন্তু মানুষের অন্তর্জগৎকে সবসময় শান্ত করতে পারেনি। উদ্বেগ, হতাশা, একাকীত্ব, প্রতিযোগিতা, সম্পর্কের টানাপোড়া থেকে ভাঙন এবং আত্মপরিচয়ের সংকট আধুনিক মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। বাহ্যিক সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও অনেক মানুষ অন্তরে শূন্যতা অনুভব করেন। এই বাস্তবতার মধ্যে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা এক গভীর আহ্বান জানায়–মানুষ যেন যিশুর হৃদয়ে আশ্রয় খুঁজে পায়।

যিশুর হৃদয় কেবল একটি ধর্মীয় প্রতীক নয়; এটি ঈশ্বরের সীমাহীন প্রেম, করুণা, ক্ষমা, ভালোবাসা, দয়া এবং শান্তির জীবন্ত প্রকাশ। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে যিশুর পবিত্র হৃদয় (Sacred Heart of Jesus) মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতীক। যে হৃদয় ক্রুশবিদ্ধ হয়েও ক্ষমা করতে জানে, বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেও ভালোবাসতে জানে, এবং মৃত্যুর অন্ধকারেও জীবনের আলো ছড়িয়ে দেয়।

বর্তমান সময়ে যিশুর হৃদয়কে 'শান্তিময় আশ্রয় কেন্দ্র' হিসেবে নতুনভাবে উপলব্ধি করা জরুরি হয়ে উঠেছে। আমরা একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কেননা হৃদয়ের উৎসধারা হলো নম্রতার অনুভব নিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন। যেখানে আমাদের কেন্দ্র হলো খ্রিস্ট যিশুর কোমল হৃদয়, যা আমাকে আশ্রয় দেবে যেখানে নিরাময়, প্রাণের আরাম ও গভীর শান্তি অনুভব করব।

ফাদার গৌরব জি. পাথাং গানে লিখেছেন,

হে পরম, পবিত্র যিশুর হৃদয়,
মম হৃদয়, তব হৃদয়ের সদৃশ করো
ভালোবাসা দিয়ে মম হৃদয় গড়ো।।

যিশুর হৃদয়; প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু: পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি, যিশুর সমগ্র জীবন ছিল মানুষের জন্য নিবেদিত। তিনি অসুস্থদের সুস্থ করেছেন, পাপীদের ক্ষমা করেছেন, অবহেলিতদের কাছে টেনে নিয়েছেন এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষদের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর হৃদয় ছিল এমন এক হৃদয় যা মানুষের কষ্টে ব্যথিত হতো। যিশু বলেন, 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে, আমার কাছে এসো; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব' *(মথি ১১:২৮)*। এই আহ্বান কেবল প্রথম শতাব্দীর মানুষের জন্য নয়; এটি আজকের উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত, ভীত এবং বিভ্রান্ত মানুষের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। যিশুর হৃদয় এমন এক আশ্রয় যেখানে মানুষ নিজেকে গ্রহণযোগ্য, প্রিয় এবং নিরাপদ অনুভব করে। যিশুর হৃদয় আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর কোনো দূরবর্তী বিচারক নন; তিনি একজন প্রেমময় পিতা, যিনি তাঁর সন্তানদের

হৃদয়ের গভীর আর্তনাদ শোনেন। তিনি চান আমরা তাঁর আশ্রয়ে প্রেমাদুর আরামে নিজেদের হৃদয়কে প্রেমময় করে তুলি।

খ্রিস্টের অনুকরণ গ্রন্থের শিক্ষা: থমাস এ কেম্পিসের বিখ্যাত গ্রন্থ খ্রিস্টের অনুকরণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। এই গ্রন্থের মূল শিক্ষা হলো–বাহ্যিক জগতের চেয়ে অন্তর্জগতের পরিবর্তন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, মানুষ পৃথিবীর সম্মান, ক্ষমতা এবং প্রশংসার পেছনে ছুটতে ছুটতে নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে। সত্যিকারের শান্তি পাওয়া যায় তখনই, যখন মানুষ যিশুর মতো নম্র, বিনয়ী এবং প্রেমময় হতে শেখে।

আজকের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে মানুষ ক্রমাগত অন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা করছে। ফলে আত্মতুষ্টি কমে যাচ্ছে এবং অস্থিরতা বাড়ছে। খ্রিস্টের অনুকরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত মূল্য মানুষের বাহ্যিক সাফল্যে নয়, বরং তার অন্তরের পবিত্রতায়। যিশুর হৃদয়ে আশ্রয় নেওয়া মানে নিজের অহংকার, ভয় এবং আত্মকেন্দ্রিকতাকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি: পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো তাঁর আধ্যাত্মিক অনুশীলনে হৃদয়ের গভীর শ্রবণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের অন্তরে ঈশ্বর কথা বলেন। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর শোনার জন্য প্রয়োজন নীরবতা, প্রার্থনা এবং আত্মপর্যালোচনা।

যিশু সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি: আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'Finding God in All Things' অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া। যখন মানুষ যিশুর হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয়কে সংযুক্ত করে, তখন সে পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখতে শেখে। যিশু সংঘের বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক বলেছিলেন, ভবিষ্যতের খ্রিস্টান হয় একজন মরমী (mystic) হবে, নয়তো খ্রিস্টান থাকবে না। তাঁর এই বক্তব্যের অর্থ হলো, কেবল ধর্মীয় আচার নয়; ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কই মানুষের বিশ্বাসকে জীবন্ত রাখে। আধুনিক মানুষ তথ্যের ভিড়ে বাস করে, কিন্তু প্রজ্ঞার অভাবে ভোগে। যিশুর হৃদয় সেই প্রজ্ঞার উৎস, যা মানুষকে নিজের অস্তিত্বের গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। হৃদয়হীন মানুষ হতে পারে না কিন্তু প্রজ্ঞাহীন মানুষ হয়। যিশুর কোমল হৃদয় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ তাই তিনি আহ্বান করেন তাঁর হৃদয় দিয়ে মানুষ মানুষকে স্পর্শ করুক।

আধুনিক মানুষের মানসিক সংকট: বর্তমান সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। উদ্বেগ, বিষণ্নতা, একাকীত্ব এবং পরিচয় সংকট বহু মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে। মানুষের হাতে স্মার্টফোন আছে, কিন্তু অনেকের জীবনে সত্যিকারের সম্পর্ক নেই। হাজারো অনলাইন বন্ধু থাকলেও হৃদয়ের কথা বলার মতো একজন

মানুষও অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে যিশুর হৃদয় আমাদের শেখায় সম্পর্কের মূল্য। তিনি মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, তাদের কথা শুনেছেন এবং তাদের মর্যাদা দিয়েছেন। যিশুর হৃদয় আমাদের জানায়; তুমি মূল্যবান, তুমি ভালোবাসার যোগ্য, তোমার ব্যর্থতা তোমার পরিচয় নয়, ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করেননি, এই উপলব্ধি মানসিক সুস্থতার জন্য গভীর শক্তি জোগায়। তাই মানুষ হিসাবে আমাদের একটু ভালোবাসা উৎসধারা খ্রিস্টের হৃদয়ে যাওয়া, যে কেন্দ্র হতে আমি আমার ও অন্যের জন্য ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে পারবো।

ফাদার গৌরব জি. পাথাং গানে লিখেছেন,

সে ভালোবাসা, যেন থাকে সদা হৃদয়ে গ্রথিয়া

তব করুণা সাগর মথিয়া জীবন সঞ্চার করো।।

করুণা ও ক্ষমার হৃদয়: মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় ক্ষতগুলোর একটি হলো অমার্জনা। অনেক মানুষ বছরের পর বছর রাগ, ক্ষোভ, অভিমান, বিরক্তি, ইগো এবং প্রতিশোধের বোঝা বহন করে। কিন্তু যিশুর হৃদয় ক্ষমার শিক্ষা দেয়। ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় তিনি প্রার্থনা করেছিলেন: 'পিতা, এদের ক্ষমা করো; কারণ এরা জানে না এরা কী করছে।' ক্ষমা করা মানে অন্যায়কে সমর্থন করা নয়; বরং নিজের হৃদয়কে ঘৃণার বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা। যিশুর হৃদয়ে আশ্রয় নেওয়া মানে ক্ষমার পথে শান্তিতে হাঁটা। এটি আত্মিক মুক্তির পথ, মানসিক আরোগ্যের পথ এবং মানবিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের পথ।

ফাদার গৌরব জি. পাথাং গানে লিখেছেন,

তব হৃদয়ে প্রেমের আঁখরে, লিখেছ মোর নাম

মম হৃদয়ে ভালোবাসা দিয়ে রচেছ স্বর্গধাম।।

নীরবতার প্রয়োজনীয়তা: বর্তমান যুগ শব্দে পরিপূর্ণ। সংবাদ, বিজ্ঞাপন, সামাজিক মাধ্যম এবং অবিরাম তথ্যপ্রবাহ মানুষের মনকে ক্লান্ত করে তুলছে। যিশু প্রায়ই নির্জনে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। এই নীরবতা ছিল তাঁর শক্তির উৎস। পবিত্র ক্রুশ সংঘের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য শেখায় যে নীরবতা হলো ঈশ্বরের ভাষা শোনার স্থান। আজকের দিনে মানুষ যদি প্রতিদিন কিছু সময় নিরব প্রার্থনা, ধ্যান এবং আত্মপর্যালোচনার জন্য রাখে, তাহলে তার মানসিক ভারসাম্য ও আত্মিক গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। যিশুর হৃদয় সেই নীরব আশ্রয় যেখানে মানুষের অন্তরের সকল দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার ঝড় শান্ত হতে শুরু করে।

ফাদার গৌরব জি. পাথাং গানে লিখেছেন,

পুন্য হাতে রেখো প্রভু মোরে প্রেমালিঙ্গনে

সুখে-দুঃখে থেকো সহায় মম জীবনে।।

যিশুর হৃদয় শক্তিশালী ভিত্তি: যিশুর জীবনের একটি বিস্ময়কর দিক হলো তিনি পাপী, অসহায়, সমস্যায় জীর্ণ, অভাবী, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, আশাহীন, ক্লান্ত এবং ভগ্ন মানুষদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। কর আদায়কারী, পাপী, অসুস্থ, বিধবা, পতিতা, দরিদ্র–সবার জন্য তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত ছিল। সমাজ যেখানে মানুষকে তার সাফল্য দিয়ে বিচার করে, যিশুর হৃদয় মানুষকে তার মানবিক মর্যাদা দিয়ে মূল্যায়ন করে। আজও অসংখ্য মানুষ নিজেদের ব্যর্থ, অযোগ্য কিংবা পরিত্যক্ত মনে করে। কিন্তু যিশুর হৃদয় ঘোষণা করে যে প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। এই উপলব্ধি আত্মসম্মান পুনর্গঠনের এক শক্তিশালী ভিত্তি।

শান্তির প্রকৃত অর্থ: পৃথিবী শান্তিকে প্রায়ই সমস্যাহীন অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু খ্রিস্টীয় শান্তি তার চেয়ে অনেক গভীর। যিশুর শান্তি হলো এমন এক অভ্যন্তরীণ স্থিতি যা শত বাধার মাঝেও টিকে থাকে। ক্রুশের পথ পাড়ি দিয়েও যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের শান্তি দিয়ে যাচ্ছি। এই শান্তি আসে ঈশ্বরের উপস্থিতির অনুভূতি থেকে। যখন মানুষ জানে যে সে একা নয়, তখন তার হৃদয়ে আশার আলো জ্বলে ওঠে।

যিশুর হৃদয় সত্যিই এক শান্তিময় আশ্রয়কেন্দ্র। এটি এমন একটি আশ্রয় যেখানে ক্লান্ত মানুষ বিশ্রাম পায়, আহত মানুষ আরোগ্য লাভ করে, পাপী ক্ষমা পায় এবং হতাশ মানুষ নতুন আশা খুঁজে পায়। বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা, মানসিক চাপ এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতার মধ্যে যিশুর হৃদয় আমাদের নতুন করে আহ্বান জানায়। তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করেন তাঁর প্রেম, করুণা এবং শান্তির মধ্যে প্রবেশ করতে। যদি মানুষ যিশুর হৃদয়ের দিকে ফিরে আসে, তবে সে শুধু ধর্মীয় সান্ত্বনা নয়, বরং জীবনের গভীর অর্থ, সম্পর্কের নতুন ভিত্তি এবং অন্তরের স্থায়ী শান্তি খুঁজে পাবে। যিশুর হৃদয় তাই কেবল বিশ্বাসের প্রতীক নয়; এটি মানবজাতির জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত এক চিরন্তন আশ্রয়, যেখানে আজও প্রতিটি ক্লান্ত আত্মা শান্তি খুঁজে পায়।

(১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

প্রয়োজন। বাংলাদেশের বাহিরে যেতে হলে কমপক্ষে চারটি কোর্স একান্ত প্রয়োজন, যেমন: শিক্ষার পাশাপাশি- ইংরেজী কোর্স, কম্পিউটার কোর্স, ড্রাইভিং ও ক্যাটারিং কোর্স করা। যাদের এই চারটি কোর্স জানা আছে, তাদের বিদেশে চাকুরী কোনো সমস্যা থাকবে না। তবে নিজেকে হতে হবে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও প্রার্থনাশীল।

একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির রয়েছে অগণিত সম্ভাবনা- শিক্ষকতা, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও কম্পিউটার সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়ার, ফ্রিলেন্সিং, ডিজাইনার, ইলেক্ট্রিক্যালসাইড, মোবালাইজেশন, পাইলট, এয়ারহোস্টেস, ক্যাটারিং প্রফেশনাল, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, গার্মেন্টস, বাইংহাউস, টেইলারিং, নার্সিং, বিউটিফিকেশন, ব্লক বাটিক, এম্ব্রোডারিং, এগ্রিকালচার, ফার্মিং, গার্ডেনিং, স্পোর্ট, ট্রান্সপোর্ট, ড্রাইভিং, ম্যানপাওয়ার ইত্যাদি। বর্তমানে পুরুষ-মহিলা সকলেই ব্যবসায় আগ্রহী। তাই যারা চাকুরীতে আগ্রহী নয় তারা হতে পারে উদ্যোক্তা অর্থাৎ নিজেই ব্যবসার মালিক।

আমার অত্যন্ত কাছের এক বন্ধু আমেরিকা প্রবাসী। আমাকে বলছিল আমেরিকাতে শিক্ষিত লোকেরা সবাই কাজই করে, বলছিল একদিন ট্যাক্সি করে নিউইয়র্ক থেকে অন্য স্ট্রেটে যাচ্ছি। দূরের রাস্তা তাই ড্রাইভারের সাথে গল্প করতে করতে যাচ্ছি। ড্রাইভারের সাথে যতই কথা বলছি, তার কথা শুনে ততই অবাক হচ্ছি। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর ও জ্ঞানের কথা বলছিলেন, আমি আরও অবাক হচ্ছিলাম। এক সময় গন্তব্য স্থলে পৌছানোর আগে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পরিচয়টা দিবেন তখন তার পরিচয় শুনে আমি হতভম্ব হলে গেলাম। তিনি কোর্টের একজন জজ। অবসর সময়ে তিনি ট্যাক্সি চালান। মনে মনে ভাবলাম এত বড় মাপের মানুষ হয়ে যদি অবসর সময়ে ট্যাক্সি চালাতে পারে, তবে আমাদের এত লজ্জা কেন? তাই ভাবি- কাজকে কখনও ছোট ভাবা যাবে না।

মহাত্মা গান্ধী, তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও প্রার্থনাশীল। তার এই বিশ্বাসের গুণে তিনি ভারতকে জয় করেছিলেন। তিনি তার পিতা-মাতা ও স্ত্রীকে অনেক ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন। তার মত আমরা কেন শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো! যারা সত্যিকারের সংগ্রাম করে, তাদের ফল কখনো শূন্য হয় না। আকাশ একটা কিন্তু আকাশে রয়েছে অগণিত তারা। ঠিক তেমনি জীবন একটা কিন্তু জীবনে রয়েছে অগণিত সম্ভাবনা।

একটা জীবন, সম্ভাবনা অগণিত

নিকোলাস (সত্য) গমেজ

মানুষের একটাই জীবন, তবে সম্ভাবনা রয়েছে অগণিত, যার পিছনে রয়েছে মানবিক বিকাশ ও জীবন গঠন। কুমার তার হাতের কারিশমা দিয়ে এটেল মাটির দ্বারা বিভিন্ন ধরণের রাইং-পাতিল ও মাটির খেলনার সরঞ্জাম তৈরি করে। কিন্তু যতক্ষণ মাটি নরম থাকে ততক্ষণ কুমারের হাতের কারিশমা কিন্তু একবার মাটি শক্ত হয়ে গেলে সেটা আর কোন কাজে লাগে না। ঠিক তেমনই একজন সন্তান জন্ম নিলে তার মায়ের হাতেই থাকে সন্তানের গঠন। মা যেভাবে সন্তান গঠন দেবে, সন্তান ঠিক সেইভাবেই গঠিত হবে। তা'হলে সন্তান গঠনের প্রথম কারিগর হচ্ছে- "পিতা ও মাতা"। এরপরের ধাপ হচ্ছে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান", যেখানে মনোযোগ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে গঠন করা। অনেকে বলে ঐ ছাত্রের মাথা ভাল না আবার এটাও বলে, ঐ ছাত্রের মাথা অনেক ভাল, অনেক Talent। সাধারণত প্রতিটি মানুষের স্মৃতিশক্তি একই হয়ে থাকে কিন্তু নির্ভর করে আমি নিজেকে কিভাবে গঠন করবো। যারা মনোযোগসহকারে লেখাপড়া করে, তারাই ভাল ছাত্র।

বর্তমানে আমরা একটা অস্থির জেনারেশন নিয়ে আছি। এক সময় যুব সমাজ মানেই ছিল স্বপ্ন, উদ্যম তার প্রতীক। কিন্তু আজকের বেশির ভাগ তরুণ প্রজন্ম যেন নিজেরা জানতে চায় না কোথায় যাচ্ছে? তাদের ভবিষ্যৎ (Ambition) লক্ষ্য কি? আমরা এমন সময়ের মানুষ যেখানে জীবনের স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই, আদর্শ নেই। এমন কি কোন পবিত্র মিশনও নেই। আজকের তরুণেরা বই পড়তে চায় না, সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখতে চায় না। তাদের দিন কাটে বেশির ভাগ স্ক্রিনের আলোয় আর রাত জেগে চলে অবিরাম স্ক্রলিং। তারা সূর্যোদয় দেখতে চায় না, সূর্যাস্তও দেখতে চায় না।

তারা জানতে চায় না ভোরের নরম আলো কত সুন্দর, কিংবা সন্ধ্যার সোনালী আভার কত প্রশান্তি। এদের বেশির ভাগ সময় থমকে আছে অনলাইনের এক অচল ঘূর্ণির ভিতরে। শরীর চর্চা, খেলাধুলা, বাইরে হাঁটা সবই যেন এক অচেনা শব্দ। আধুনিক এ প্রজন্ম রৌদ্রে হাঁটতে চায় না, বৃষ্টিতে ভিজতে চায় না, ঘাসের গন্ধ, মাটির স্পর্শ, কিংবা নদীর জলে ডুব দেওয়ার রোমাঞ্চ সব কিছু তাদের কাঁধে যেন এক ধরণের এলার্জি।

তারা আধ-ঘন্টা হাঁটতে চায় না ক্লান্ত হয়ে যাবে বলে, অথচ আধ-ঘন্টা রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে কোনো সমস্যা নেই। শারীরিক দুর্বলতার চেয়েও ভয়ঙ্কর বিষয় হলো মানসিক স্থবিরতা। এই প্রজন্মের অনেকের মধ্যে অনুপস্থিত শৃঙ্খলা, বিনয় ও শ্রদ্ধাবোধ। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মুরুব্বিদের প্রতি কোনো সম্মান দেখাতে চায় না বরং পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে যায়।

সামান্য ধাক্কা লাগলেও "সরি" বলার সৌজন্য থাকে না। এরা নিজেদের মতকে চূড়ান্ত মনে করে, একটু বুঝিয়ে বললে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। পাবলিক বাসে দেখা যায় এক অদ্ভুত চিত্র! বয়োজ্যেষ্ঠ যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন অথচ পাশে বসে আছে কিশোর বা তরুণ, কেউ উঠতে চায় না। আমাদের প্রজন্ম কতটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এক সময় আমরা বইয়ের পাতায় বেড়ে উঠতাম। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সব ছিল জীবনের অংশ। আজকের তরুণেরা সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তারা জানতে চায় না কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের কথা, বোঝে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতার সৌন্দর্য বা এরা যেন তাদের কাছে অপরিচিত। বইয়ের জায়গা নিয়েছে ফেইসবুক, ইউটিউব, টিকটক ও মোবাইলের ঝলমলে দুনিয়া। সেখানে গভীরতার চেয়ে জনপ্রিয়তা বড়। আজকাল জনপ্রিয়তার পথে নামতে গিয়ে অনেকেই নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, এই প্রজন্মে Unskill। তারা শুধু মোবাইলের স্ক্রীনে আঙ্গুল চালাতে জানে। কিন্তু তারা হাঁটতে চায় না, সাঁতার কাটতে চায় না, গাছে চড়তে চায় না। পাহাড় পর্বতে বা নদী পাড়ি দেওয়ার মতো দুঃসাহসী মনোবল তাদের নেই বললেই চলে। তাদের কাছে জীবন মানে আরাম আর আরাম মানেই ডিজিটাল নির্ভরতা। কোন কিছুতে তাদের ধৈর্য রাখতে চায় না। চায় দ্রুত ফলাফল, তাৎক্ষণিক সাফল্য। কিন্তু পরিশ্রমের দ্বারের কাছেও যায় না। হতাশ হয়ে মন যেন ভেঙ্গে যায়। আত্মবিশ্বাস হারায়, আরও কঠিন হলো এদের কাছে জীবনের অর্থ "ফলোয়ার সংখ্যা"। লাইক, ফলোয়ার, ভার্চুয়াল প্রশংসা। বাস্তব জীবনের সম্মান অনভিজ্ঞতার সম্পর্ক সবকিছু গৌণ হয়ে গেছে। বর্তমান প্রজন্ম জানতে চায় না কখন থামতে হবে, কখন শুনতে হবে ও কখন বলতে হবে। এই সব বিভ্রান্তির ভিতর দিয়ে অদ্ভুত দিকহীন সমাজ গড়ে উঠছে।

যেখানে মানুষ আছে কিন্তু মন নেই, মুখ আছে কথা নেই, স্বপ্ন আছে লক্ষ্য নেই। প্রজন্মের বদল হয় এটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু প্রতিটির প্রজন্মের উচিত নিজের সময় অর্থবহ করে তোলা। মানবিক মূল্যবোধে দাঁড়িয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজকের তরুণের হাতে আছে সেই সম্ভাবনা যদি তারা একটু থামে, একটু শোনে, একটু বোঝে। যদি তারা বই হাতে নেয়, সূর্যোদয় দেখে, মাটির গন্ধ নেয় তা'হলে হয়তো অস্থির জেনারেশন একদিন নতুন করে শিখবে কিভাবে মানুষ হওয়া যায়।

যারা ভুল পথে চলে। যাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা কোন পবিত্র মিশন থাকে না, তাদের লেখাপড়ার মন বসে না, তাদের মধ্যে আবেগ কাজ করে, একাকীত্ব মনে হয় আর বিষণ্নতায় ভোগে। তখন লেখাপড়া তো দূরের কথা কোনো কিছুই ভাল লাগে না, পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয় না। কোনো রাস্তা না পেয়ে আত্মহত্যা বেছে নেয় যা এই প্রজন্মের জন্য কাম্য নয়। নিজের চক্ষু দ্বারা দেখ- "The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light."- *Matthew /6:22-23 and Luke 11:34* একাকীত্ব ও আবেগই মানুষকে বিষণ্নতায় ফেলে। আর বিষণ্নতা হচ্ছে একটি রোগ। যার প্রধান প্রতিকার হচ্ছে- "একে অন্যের সাথে সহভাগিতা করা।" মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে তার পিতা ও মাতা। আর মা হচ্ছে আরও কাছের, যার সাথে যে কোনো বিষয়ই সহভাগিতা করা যায়। এরপর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সহভাগিতা করা যায়। এমনকি পুরোহিতদের সাথেও সহভাগিতা করে সুন্দর জীবন গঠন করা যায়।

বর্তমানে আমরা যদি ওয়েস্টার্ন দেশের কথা চিন্তা করি, বিশেষ করে আমেরিকার লোকজন রাত ৮ টার পর রাতের খাবার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে আর ভোরে উঠে তারপর সারাদিনের কর্ম শুরু করে, এতে একজন মানুষ নিয়মের মধ্যে থাকে আর তাদের জীবনটা হয় সুন্দর। শুধু শিক্ষা নয়, শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার চিন্তা করতে হবে। পড়াশোনা করে বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিতে হবে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ একান্ত

(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

ওস্তাদ লিও জে. বাড়ৈ-এর ‘জীবন আলপনা’

জুলিয়েট সুসমিতা বাড়ৈ

সমাজে অনেক ক্ষণজন্মা আসেন নিজের আলোয় আলোকিত করতে কোনো ভূবন। আমাদের খ্রিস্টান সমাজেও তেমন অনেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবে নিভৃতে অবদান রেখে গেছেন। তেমনই একজন হলেন ওস্তাদ লিও জে. বাড়ৈ।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া থানার চৌরখুলী নামক গ্রামে এক খ্রিস্টীয় পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল বিকাল ৪টার দিকে ঢাকার উপকণ্ঠ সাভার উপজেলার আনন্দপুর সিটিলেন এলাকায় নিজ বাড়িতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

শাস্ত্রীয় সংগীতে হাতেখড়ি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে “নটর ডেম কলেজ”-এ অধ্যয়নকালে শ্রদ্ধেয় ফাদার জেমস টি বেনাস (সহকারী অধ্যক্ষ)-এর কাছে। ১৯৬৮-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (দশ বছর) হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের তিনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন, পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে “মিউজিক কলেজ একাডেমি” সেগুনবাগিচাতে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় তিন বছর শিক্ষাকালীন সময়েই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বারীন মজুমদার (বাপ্পা মজুমদার-এর বাবা) এবং তার স্ত্রী ইলা মজুমদারের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার (বিশ্বভারতী) ঢাকা এলে লিও জে বাড়ৈ স্বল্পকালীন সময়ের জন্য তাঁর কাছেও তালিম গ্রহণ করেন। শৈলজা বাবুর শেখানো ও পরিচালনায় মহিলা সমিতি মঞ্চে ‘বর্ষামঙ্গল’ নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কাদেরী কিবরিয়া, ইকবালসহ অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে লিও জে বাড়ৈও একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। ১৯৭৮-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (সাড়ে ছাব্বিশ বছর) “মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি)” একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় (এনজিও) ফিন্যান্স অফিসার হিসাবে কাজ করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সংস্থাটির প্রয়োজনে এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকার পেনসেলভিনিয়াতে যান। কাজ শেষে প্রথমে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক পরে ক্যানসাস হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

১৯৭৯-২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২১ বছর “সুর-রং একাডেমী অব ক্লাসিক্যাল মিউজিক” এবং ওস্তাদ আখতার সাদমানী সাহেবের কাছে ব্যক্তিগতভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ওস্তাদ সাদমানী সাহেবের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধেয় আমিনুর রহমান সাহেবের আমন্ত্রণে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ডাগর বাণীর ধারক ও বাহক ডাগর ভ্রাতৃ দ্বয় ওস্তাদ এন জহিরুদ্দীন ডাগর ও ওস্তাদ এন ফৈয়াজউদ্দীন ডাগর বহুবার বাংলাদেশে এসেছেন, প্রতিটি অনুষ্ঠানেই লিও জে. বাড়ৈ তাদের তানপুরায় সহযোগিতা করেন।

তিনি ১৯৮৬-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর “শেরে বাংলা নগর কমিউনিটি সেন্টারে” একজন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ বেতার ও ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও মঞ্চে নিয়মিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পরিবেশন করে আসছেন।

১৯৮৭-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই বছর তিনি “ধীর-আলী-সংগীত” একাডেমীতে একজন সিনিয়র উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৮৮-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৬ বছর লিও জে. বাড়ৈ বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা), ঢাকায় একজন সিনিয়র উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন।

তিনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ওস্তাদ আখতার সাদমানী সাহেবের সঙ্গে দিল্লী যান এবং দুজনেই ওস্তাদ জহিরুদ্দীন সাহেবের কাছে তালিম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি একাই কয়েকবার দিল্লী যান এবং জহিরুদ্দীন সাহেবের কাছে তালিম গ্রহণ করেন।

সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ লিও জে বাড়ৈ ছিলেন সুরকার এবং গীতিকার হিসাবে বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর সংগীত জগতে এক অনন্য নাম। বাণীদীপ্তির প্রকাশিত বিভিন্ন জনপ্রিয় গান তার সুর করা ও স্ব-কণ্ঠে গাওয়া, যার অধিকাংশ আজ অবধি প্রচারিত হচ্ছে দেশ এবং দেশের বাইরে।

সাভার সাংস্কৃতিক সংসদ, সাভার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সাভার ক্লাব এবং সাভারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর সাভার এলাকার কার্যক্রমের সাথে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুক্ত ছিলেন।

২০১৫-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবীন-প্রবীন শিল্পীদের অংশগ্রহণে চ্যানেল আই-এর আয়োজনে বাংলা খেয়ালের স্রষ্টা, সুরকার, গীতিকার ও নাট্যকার আজাদ রহমান-এর পরিচালনায় বাংলা খেয়াল প্রসারে ওস্তাদ লিও জে বাড়ৈ-এর অবদান এবং একাগ্রতা ছিল অনবদ্য।

তিনি থাকবেন আমাদের মাঝে, তার অসংখ্য অনুরাগীর ভালোবাসায়।

গল্প

বাবার শেখানো জীবন

ক্ষুদীরাম দাস

ময়মনসিংহ জেলার এক শান্ত, সবুজে মোড়া খ্রিস্টান পাড়ায় পিটার গমেজের সংসারটি ছিলো খুবই সাধারণ; কিন্তু সেই সাধারণতার ভেতর লুকিয়ে ছিলো গভীর শিক্ষা। পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো ইটের গির্জাটি যেনো পুরো এলাকার প্রাণ। রোববার ভোর হলেই গির্জার ঘণ্টাধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো; আর সেই শব্দেই পিটার গমেজের ঘুম ভাঙতো।

পিটার তখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একজন মানুষ। চুলে পাক ধরেছে, চোখে মুখে ক্লান্তির রেখা, তবুও তার মনোবল ছিলো অটুট। স্ত্রী মার্থা গমেজ অনেক বছর আগে অসুস্থতায় মারা গেছেন। সেইদিনের পর থেকে পিটার একাই তার একমাত্র মেয়ে এলিজাকে মানুষ করেছেন। কোনো অভিযোগ, কোনো আক্ষেপ কখনো তার মুখে শোনা যায়নি।

এলিজা তখন কলেজে পড়ে। অবিবাহিত, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তার চোখে ছিলো স্বপ্ন; কিন্তু সেই স্বপ্নগুলো ছিলো দায়িত্ববোধে বাঁধা। ছোটবেলা থেকেই সে দেখে এসেছে, বাবা কীভাবে ভোরে উঠে প্রার্থনা করে, কীভাবে নিজের কষ্ট লুকিয়ে রেখে সংসার চালায়, কীভাবে ঈশ্বরের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে জীবনকে সামনে এগিয়ে নেয়।

প্রতিদিনের মতই ভোরে পিটার ঘুম থেকে উঠে। ঘরের ভেতর নীরবতা থাকলেও রান্নাঘরে গিয়ে চুলা জ্বালানো, চা বানানো নিত্যদিনের কাজ। তারপর বাইবেল খুলে টেবিলের পাশে বসে। এলিজা ঘুম ভাঙার পর দরজার আড়াল থেকে বাবাকে দেখছিলো। বাবার ঠোঁট নড়ছিলো, চোখ বন্ধ, যেনো সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলছে।

একদিন এলিজা সাহস করে বললো, "বাবা, আমি কি তোমার সাথে প্রার্থনা করবো?"

পিটার তাকালো। তাকাচ্ছিলো মানে শুধু দেখা নয়, ভেতরের আনন্দ লুকোচ্ছে। বললো, "হ্যাঁ মা, অবশ্যই। ঈশ্বরের কাছে একসাথে দাঁড়ালে মন শক্ত হয়।"

সেই দিন থেকে এলিজা বাবার পাশে বসে প্রার্থনা করতো। শুরুতে তার ভালো লাগতো না, ঘুম পেতো, মন বসতো না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে বুঝতে শুরু করলো, এই নীরব সময়টাই বাবার শক্তি।

পিটার শুধু প্রার্থনাই শেখাননি, শেখান সংসারের কাজও। একদিন বললো, "মা, আজ রান্নাটা তুমি করবে।"

এলিজা অবাক হয়ে বললো, "আমি পারবো?"

পিটার হাসলো। হাসলো মানে সাহস দিলো। বললো, "পারবো না ভেবে কেউ কখনো পারেও না।"

সেই দিন এলিজা প্রথম ভাত রান্না করলো। ভাত একটু বেশি নরম হয়েছিলো, ডালে লবণ কম। কিন্তু পিটার একটুও অভিযোগ করলো না। বললো, "ভালো হয়েছে। শেখার শুরু এভাবেই।"

এভাবে দিনে দিনে এলিজা শিখলো ঝাড়ু দেয়া, কাপড় ধোয়া, বাজার করা, টাকার হিসাব রাখা। পিটার সব সময় বলতো, "এই কাজগুলো তোমার মৃত্যু পর্যন্ত কাজে লাগবে।"

একদিন সন্ধ্যায় বাবা-মেয়ে একসাথে বসে খাবার খাচ্ছিলো। পিটার হঠাৎ বললো, "মা, মনে রেখো, এ জগতে জন্মদাতা পিতা ছাড়া কেউ নিঃস্বার্থ না। তুমি কাজ করো বা না করো, আমি তোমাকে ভাত কাপড় দেবো। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, সমাজ; কেউ কিছু দেবে না যদি কাজ না করো।"

এ কথাগুলো এলিজার মনে গভীর ভীত তৈরি করলো। সে বুঝলো, বাবা ভয় দেখাচ্ছে না, সত্য শেখাচ্ছে।

কলেজে এলিজার বান্ধবীরা ছিলো আধুনিক চিন্তার। তারা বলতো, "সংসারের কাজ করলে মানুষ ছোট হয়।" কেউ আবার বলতো, "বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এলিজা এসব কথা শুনছিলো, কিন্তু তার মনে বাবার মুখটাই ভেসে উঠতো।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে সে দেখলো বাবা ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। শরীর কাঁপছে। এলিজা দৌড়ে গেলো। বললো, "বাবা, কী হয়েছে?"

পিটার বললো, "কিছু না মা, একটু দুর্বল লাগছে।"

সেই দিন থেকেই এলিজা সংসারের ভার পুরোপুরি কাঁধে নিলো। রান্না, ওষুধ, বাজার–সবকিছু সে করছিলো। পিটার বিছানায় শুয়ে তাকাচ্ছিলো। তাকাচ্ছিলো মানে ভেতরে ভেতরে সন্তুষ্ট হচ্ছিলো।

রোববার সকালে এলিজা একাই বাবাকে নিয়ে গির্জায় গেলো। ইটের গির্জার ভেতরে বসে সে প্রার্থনা করছিলো। ফাদার জন উপদেশে বললেন, "পিতামাতার সেবা ঈশ্বরের চোখে সবচেয়ে বড় সেবা।"

এই কথা এলিজার মনে আরো শক্ত করে গেঁথে গেলো। সে ভাবলো, বাবার সেবা মানেই তো ঈশ্বরের পথে থাকা।

সময় যেতে লাগলো। পিটার কিছুটা সুস্থ হলো, কিন্তু আগের মতো শক্তিশালী আর হলো না। এলিজা তখন প্রতিমাসে টাকার হিসাব রাখতো। সংসারের সঙ্কট এলেও সে ভীত হয়নি। বাবার শেখানো হিসাবের নিয়মে সব সামলাতো।

পাড়ার লোকজন অবাক হয়ে তাকাতো। কেউ বলতো, "এই মেয়ে আলাদা।" কেউ বলতো, "এতো দায়িত্ব ও নিতে পারে!" পিটার এসব শুনে চুপ থাকতো, শুধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতো।

একদিন এলিজার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এলো। পাত্র ভালো চাকরি করে, শহরে থাকে। আত্মীয়রা খুশি। এলিজা বাবার কাছে এসে বললো, "বাবা, তুমি কী বলো?"

পিটার ধীরে বললো, "মা, যে মানুষ সংসারের কাজকে ছোট করে দেখে, তার সাথে জীবন কঠিন হয়।"

এলিজা পাত্রের সাথে কথা বললো। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বুঝলো, লোকটি তার বাবার সেবাকে বোঝে না। সে বিনয়ের সাথে না বললো।

সময় আরো এগিয়ে গেলো। পিটার একদিন এলিজার হাত ধরে বললো, "মা, আমি একদিন থাকবো না। তখন এ শিক্ষা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

এলিজার চোখে জল এলো। বললো, "বাবা, তোমার শেখানো জীবন আমি কখনো ছাড়বো না।"

কয়েক মাস পরে পিটার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তার বললো, সময় কম। এলিজা দিনরাত বাবার পাশে বসে থাকতো। খাচ্ছিলো কম, ঘুমাচ্ছিলো কম। তবুও মুখে কোনো অভিযোগ নেই।

এক ভোরে পিটার এলিজার দিকে তাকিয়ে বললো, "মা, আমি গর্বিত। তুমি আমার শিক্ষা সম্মান করেছো।"

এ কথাটুকুই এলিজার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়ে থাকলো।

সেদিন সকালে পিটার পরলোকগমন করলেন। গির্জার ঘণ্টা বাজলো। পুরো পাড়া নীরব হয়ে গেলো। এলিজা বাবার কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। চোখে জল, কিন্তু মন ভাঙেনি।

পিতার মৃত্যুর পরেও এলিজা বাবার শেখানো জীবন আঁকড়ে ধরলো। শোক তাকে ভেঙে দিতে পারেনি, বরং ভেতরে ভেতরে আরও শক্ত করে তুলেছিলো। গির্জার ইটের মেঝেতে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হতো, বাবা যেনো এখনো পাশে পাশে হাঁটছেন। প্রতিটি প্রার্থনায়, প্রতিটি সেবায় সে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেতো– "মা, দায়িত্ব থেকে কখনো পালাবে না।"

এলিজা গির্জার কাজ আরও নিয়মিতভাবে শুরু করলো। শিশুদের পড়াত, অসহায়দের খাবার দিত, বৃদ্ধদের পাশে বসে তাদের কষ্টের কথা শুনত। অনেকে জিজ্ঞেস করতো, "তুমি এতো কষ্ট করছো কেনো?" এলিজা শান্ত কণ্ঠে বলতো, "বাবা শিখিয়েছেন।" এই ছোট্ট উত্তরেই যেনো তার জীবনের সমস্ত দর্শন লুকিয়ে থাকতো।

সমাজ আবারও বিয়ের কথা তুললো। কেউ সহানুভূতির সুরে বললো, কেউ উপদেশের ভঙ্গিতে। এলিজা কারো কথায় রাগ করলো না, ভয়ও পেলো না। সে জানতো, বিয়ে জীবনের শেষ লক্ষ্য না, দায়িত্ববোধই আসল পরিচয়। বাবার শেখানো জীবন তাকে এ সাহস দিয়েছিলো।

প্রতিমাসে সে বাবার কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতো। ফুল রাখতো, চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতো। তার মনে হতো, বাবা হারিয়ে যাননি–তিনি তার চরিত্রের ভেতর, কাজের ভেতর, বিশ্বাসের ভেতর বেঁচে আছেন।

একদিন গির্জার ফাদার জন বললেন, "এলিজা, তুমি অনেকের জন্য উদাহরণ।" কথাটা শুনে এলিজা মাথা নিচু করলো। তার চোখে জল এলো, কিন্তু সেই জল ছিলো দুর্বলতার না, কৃতজ্ঞতার।

সে বুঝলো, বাবার শেখানো শিক্ষা শুধু তার নিজের জন্য না; এটা সমাজের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। একজন অবিবাহিত মেয়ে হয়েও সে সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে, শক্ত হতে পারে, সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে।

গল্পটা এখানেই শেষ হলেও শিক্ষাটা শেষ হয় না। কারণ এই জগতে জন্মদাতা পিতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর তার শেখানো জীবন–সত্যিই মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরেও মানুষের পথ দেখায়। ❑

বাবা তোমাকে ধন্যবাদ

ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

বাবা, আজ তোমাকে কিছু কথা বলবো। যদিও তুমি আমার এই কথাগুলোর একটি অক্ষরও পড়তে পারবে না। তবুও লিখছি। তুমি তো লিখতে-পড়তে জানো না আর কখনো জানবেও না! কেননা তুমি কখনো স্কুলের চৌকাঠ মাড়াওনি। তাতে কি! এই তুমিই আমাদের চার ভাইয়ের শৈশবে আমাদের হাতে একে একে পেন্সিল-কলম তুলে দিয়েছিলে। আর প্রতিদিন পৌঁছে দিয়েছিলে স্কুলের চৌকাঠ পর্যন্ত। বাবা, তোমার সামনে বসে আজকের কথাগুলো কোনদিনই বলতে পারিনি; আর কোনদিন বলতে পারবো কিনা জানিনা। অনেকবার দেখেছি, তোমাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই বুকের ভেতরটায় কিছুটা কষ্ট আর কৃতজ্ঞতা একসাথে জমে ওঠে।

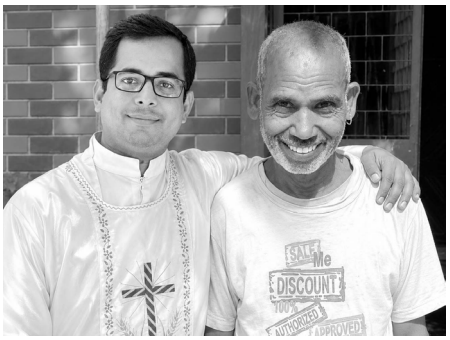

আমাদের চার ভাইকে তুমি ও মা মিলে খুব সাধারণ ও দরিদ্র একটা পরিবারে মানুষ করেছো। যার দরুণ তোমার বড় ছেলে আজ ঢাকার একটি স্বনামধন্য রেস্তোরার শেফ, মেজো ও সেজো ছেলে ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং ছোট ছেলে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত। বাবা, তুমি কলম ধরতে পারোনি ব'লে দুঃখ ক'রো না; জেনে রাখ আমরা চারভাই তোমার কলম। তুমি সুন্দর ক'রে আর দশজনের মতো গুছিয়ে কথা বলতে পার না ব'লে ব্যথিত হয়ো না; বিশ্বাস করো আমরা চারভাই তোমার প্রাঞ্জল বাক্‌শক্তি।

আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখে এসেছি তুমি প্রতিদিন পরের বাড়িতে সকাল থেকে সন্ধ্যা দিনমজুরের কাজ করতে। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কোনো কিছুই তোমাকে থামাতে পারেনি। তুমি পরের বাড়িতে অনেকবার হয়তো পেট ভরে খাওনি কিন্তু আমরা যেন খেয়ে-পড়ে থাকতে পারি, তোমার ছিল এই একটিই উপাসনা। জানো বাবা, সপ্তাহ শেষে তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা মজুরীর টাকা দিয়ে যখন আমাদের কদমতলী হাট থেকে সিলভার কার্প বা পাঙাস মাছ এনে খেতাম, তখন তা আমাদের কাছে অমৃতের মতো লাগতো।

বাবা, আজ অনুভব করি, তোমার দু'হাতের ও পায়ের ফাটা তালুতে লকলকে ঘা-গুলো শুধু কঠোর পরিশ্রমের চিহ্নই ছিল না বরং তা ছিল আমাদের ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে দেবার স্মারকচিহ্ন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, তুমি পরের বাড়িতে কাজ করার সময় কখনো নিজেকে অসুস্থ দেখাওনি। কখনো তোমাকে দিনের বেলায় বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে দেখিনি। দেখিনি কাজ বাদ রেখে সময় নষ্ট করতে। তুমি যখন বাড়িতে থাকতে তখন কিছু না কিছু করতেই থাকতে; যেন কাজ না ক'রে তুমি থাকতেই পার না। বাবা, তুমি তোমার কোনো স্বপ্নের কথা আমাদের কাছে বলতে না পাড়লেও আমরা তা হৃদয় দিয়ে বুঝে নিয়েছিলাম।

আমাদের চার ভাইয়ের জীবনে জড়িয়ে আছে তোমার অপরিমেয় আত্মত্যাগ। তুমি যদি কখনো হাল ছেড়ে দিতে, তাহলে নিশ্চিত তোমার সন্তানেরা আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পারতো না। বাবা, ছেলেবেলায় আমরা অনেক সময় তোমার সঙ্গে রাগ করেছি, তোমার অভিব্যক্তি বুঝিনি, তোমার কষ্টকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি। সেজন্য তোমার সন্তানদের ক্ষমা করে দিও। এখন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি, তুমি নিজের জীবনের শত-সহস্র চাওয়া-পাওয়া নীরবে বিসর্জন দিয়ে তোমার সন্তানদের চাওয়া-পাওয়া তিলে-তিলে বাঁচিয়ে রেখেছ।

বাবা, আমাদের সমাজে তুমি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেনা, ছিলেনা কোনো বড় কর্মকর্তা। সমাজে তোমার অবস্থান ছিলো নিতান্ত গোনার বাইরে। আর দেখ, আজ তুমি এমনই একজন মানুষ; যার সততা, পরিশ্রম ও জীবন-সাধনার কাছে অনেক বড় মানুষের জীবনও ছোট হয়ে যায়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এমনই, যিনি যুগে যুগে ন্যায়বান; যাতে দীনগণ হয় সমাজে মহান।

বাবা, যদি কেউ কখনো জানতে চায়, আমাদের জীবনে সবচেয়ে মহান শিক্ষক বা দার্শনিক কে, আমরা নিঃসন্দেহে তোমার কথাই বলব। কেননা তুমি পুঁথিগত বিদ্যা থেকে নয় বরং নিজের জীবন দিয়ে আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছ। তুমি তোমার কর্ম-সাধনা দিয়ে আমাদের শিখিয়েছ- চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ সেথা শির। বাবা, আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তোমার জীবন, কর্ম ও আদর্শ আমাদের মাথার মুকুটস্বরূপ। তুমি জগতের একজন সুখী বাবা হও; করুণাময় ঈশ্বরের কাছে সবসময় এমনটাই আমাদের প্রার্থনা। ❑

বহুল আলোচিত ফুটবল বিশ্বকাপ

মূল কথা: দু'টি দল, দুটি দেশ, বাইশজন খেলোয়াড় এবং একটি বল আর হাজারো মানুষের আশা প্রত্যাশার নাম ফুটবল। প্রতি চার বছর পর পর হাজারো মানুষ প্রতিক্ষায় থাকে এই ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য। দূরত্ব লক্ষ লক্ষ মাইল হলেও ফুটবলের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ, ভারত ও গোটা বিশ্বে। বাংলাদেশ তখন সাজে নানান দেশের পতাকায়, তখন বাংলাদেশ হয়ে যায় এক খণ্ড বিশ্ব যেখানে দেখা মেলে যার যার প্রিয় দলের; প্রিয় খেলোয়াড়দের। তাই এই বিশ্বকাপকে পেছনের গল্পটা কি, কিভাবে বিশ্বকে মাতালো এই ফুটবল। তাই আসুন সংক্ষিপ্ত আকারে এর পেছনের ইতিহাসটা জেনে নেই।

বিশ্বকাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: আনুষ্ঠনিকভাবে বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। এরপর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ছিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া ব্রিটিশ হোম চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটিকে ১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের অলিম্পিকে প্রদর্শনী খেলা হিসেবে রাখা হয় তবে এর জন্য কোন পুরস্কার বরাদ্দ ছিল না। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এফএ'র পরিকল্পনা অনুযায়ী অলিম্পিকে ফুটবল প্রথম আনুষ্ঠানিক খেলার মর্যাদা পায়। এই প্রতিযোগিতা ছিল অপেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য এবং এটিকে প্রতিযোগিতার চেয়ে প্রদর্শনী হিসেবেই বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯০৮ ও ১৯১২ দু'টি অলিম্পিকেই গ্রেট ব্রিটেন (যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল ইংল্যান্ড জাতীয় অপেশাদার ফুটবল দল) জয়লাভ করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে, ফিফা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতাকে "অপেশাদার বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ" হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয় এবং এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এর সূত্র ধরে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্ম অলিম্পিকে বিশ্বের প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় মিশর ও তেরটি ইউরোপীয়ান দল এবং বেলজিয়াম স্বর্ণপদক জিতে নেয়। উরুগুয়ে ১৯২৪ ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ লাভ করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ফিফা অলিম্পিকের বাইরে আলাদাভাবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার শতবর্ষে পা দেয়া দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকে ফিফা তাদের প্রথম বিশ্বকাপের স্বাগতিক দেশ হিসেবে নির্বাচন করে। এরপর থেকে বিশ্বকাপটি ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃতকরণ এবং বিন্যাস পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৩২ দলের চূড়ান্ত টুর্নামেন্টের আগে দুই বছরব্যাপী বাছাই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিশ্বের ২০০ টিরও বেশি দল অংশ নেয়। শেষ ২০২২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা তৃতীয়বারের মতো বিজয়ী হয়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বকাপ বিজয়ী উরুগুয়ে দল

তবে প্রথম বিশ্বকাপের প্রথম খেলা হয় ফ্রান্স ও মেক্সিকোর মধ্যে। যেখানে মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম জয় পায় ফ্রান্স। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম গোলটি করেন লুসিয়েন লরেন্ট। এবং প্রথম রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেলজিয়ামের জ্যাঁ ল্যাভেগনাস। ওই বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটিও তিনি পরিচালনা করেন।

বিশ্বকাপ নিয়ে রোমাঞ্চকর কিছু তথ্য:

প্রথম লাল কার্ড: পেরুর মালিও ভেলা ক্যাসাও, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বকাপে পেরু ও রোমানিয়ার মধ্যকার ম্যাচে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে লাল কার্ড দেখে বহিস্কৃত হন।

প্রথম হ্যাটট্রিক: প্রথম বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাট পেটেনাউদ প্যারাগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম হ্যাটট্রিক করেন।

প্রথম পেনাল্টি: ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের একই বিশ্বকাপে চিলির কার্লোস ভিদাল প্রথম পেনাল্টি শট নেন। ওই শটটি ঠেকিয়ে দিয়ে প্রথম পেনাল্টি সেভ করেন গোলকিপার অ্যালিক্সেস অ্যালিক্স থিওপট (ফ্রান্সের)।

পেনাল্টিতে প্রথম গোল: ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বকাপে মেক্সিকোর ম্যানুয়েল রোসাস পেনাল্টিতে প্রথম গোল করেন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে।

প্রথম চ্যাম্পিয়ন: প্রথম বিশ্বকাপ জিতে নেয় স্বাগতিক দেশ উরুগুয়ে। আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে হারিয়ে এই গৌরব অর্জন করে তারা।

প্রথম আত্মঘাতী গোল: ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বকাপে মেক্সিকোর ম্যানুয়েল রোসাস বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম আত্মঘাতী গোল করে নিজেদের জালেই বল জড়ান।

প্রথম মাসকট: ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম মাসকট প্রচলন শুরু হয়।

প্রথম থিম সং: প্রথম থিম সংয়ের প্রবর্তন চালু হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের চিলি বিশ্বকাপ থেকে।

প্রথম আফ্রিকান দেশ: আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে প্রথম খেলার যোগ্যতা অর্জন করে মিসর। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল দলটি।

প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার: বিশ্বকাপের খেলা প্রথম টেলিভিশনে সম্প্রচার হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় সারা বিশ্বে এটি ছিল সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া ইভেন্ট।

প্রথম গোল্ডেন বল ও বুটের প্রচলন: ১৯৮২ বিশ্বকাপ থেকে প্রথম সেরা খেলোয়াড়কে গোল্ডেন বুট ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে গোল্ডেন বল দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

প্রথম ড্র ম্যাচ: বিশ্বকাপে প্রথম ড্র ম্যাচ হয় ইতালি ও স্পেনের মধ্যকার ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাচটি।

বিশ্বকাপের ট্রফি:

জুলে রিমে কাপ: জুলে রিমে কাপ (প্রকৃত অর্থে যার নাম দেয়া হয়েছিল ইংরেজিতে 'ভিক্টরি') ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ীদের প্রদান করা হত। ফিফা ইতিহাসের ৩য় প্রেসিডেন্ট জুলে রিমে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কোন আন্তঃদেশীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের পক্ষে ভোট প্রদান করেছিলেন। তার এক বছর পরই তিনি বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের হাতে ট্রফি তুলে দিতে

সমর্থ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জুলে রিমের স্মরণেই এই ট্রফির নামকরণ করা হয় জুলে রিমে কাপ। ফ্রেঞ্চ ভাস্কর আবেল লেফলয়োর দ্বারা ডিজাইন করা এই ট্রফিতে প্রাচীন গ্রীক পুরাণের বিজয়ের দেবীকে চিত্রায়িত করা হয়েছিল যাকে কিনা একটি দশ কোণা বিশিষ্ট কাপ হাতে দেখা যায়। এই অনন্য শিল্পটির ওজন ছিল ৩.৮ কেজি, এটি সোনায় মোড়ানো রুপা দিয়ে তৈরি ছিল এবং লাপিস লাযুলির ভীতের উপর দাঁড় করানো ছিল। তাই এই ট্রফি 'সোনালি দেবী' বলে একটি ডাকনামেও লোকমুখে সুপরিচিত ছিল।

জুলে রিমে কাপ

নতুন ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি: ব্রাজিলকে জুলে রিমে কাপ আজীবনের জন্য দিয়ে দেওয়ার পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফিফা বিশ্বকাপের জন্য ফিফাকে একটি নতুন ট্রফি নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সাত দেশের ভাস্করদের থেকে মোট ৫৩ টি ডিজাইন উত্থাপন করা হয়েছিল। সিল্‌ভিও গাজ্জানিগা যিনি কিনা এই বিশ্বকাপ ট্রফির কারিগর তিনি নিজেই ২ টি ডিজাইন জমা করেছিলেন। তবে তার প্রথম ডিজাইনটিই গৃহীত হয়। পূর্বসূরির তুলনায় নতুন ট্রফিটি ছিল তুলনামূলকভাবে ভারি, ৫ কেজি ওজনের ১৮ ক্যারট সোনা দিয়ে তৈরি। ট্রফিটির মোট ওজন ছিল ৬.১৪২ কেজি এবং উচ্চতা ৩৬.৮ সেন্টিমিটার। ট্রফির ভীতটির ব্যাস ১৩ সেন্টিমিটার যেটি কিনা দুই স্তরের ম্যালাসাইট (অলঙ্কারে ব্যবহৃত সবুজ পাথর) দ্বারা আবৃত। এই দুই স্তর সবুজ ফুটবল মাঠকে সম্বোধন করে থাকে। কাপের উপরের দিকে দুইটি মনুষ্য মূর্তি দেখা যায় যারা গোলাকার পৃথিবী স্বরূপ বস্তুকে ধরে রেখেছে।

ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির ভীতটি দুইটি সবুজ ম্যালাসাইটের আবরণে আবদ্ধ। এই দুইটি আবরণকে একটি সোনালী স্তর পৃথক করেছে যেখানে ইংরেজিতে FIFA WORLD CUP কথাটি স্পষ্ট করে খোদাই করা আছে। পুরো ট্রফিটি একটি সোনালী প্লেটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাপের নিচের দিকে বিশ্বকাপ জেতা দেশগুলোর নাম তাদের নিজ দেশের ভাষায় খোদাই করা আছে। যেমন: "1974 Deutschland" অথবা "1994 Brazil"। নামগুলো গোলাকার সারিতে লেখা আছে এবং ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়নদের নামের জন্যও আলাদা জায়গা আছে।

কোথায় সংগৃহীত হয় এই ট্রফি: ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন দেশের কাছে এই ট্রফিটি থাকতো পরবর্তী বিশ্বকাপ মূল পর্বের ড্র না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এখন আর এমনটি করা হয় না। বর্তমান ফিফার নিয়মানুযায়ী, প্রতি বিশ্বকাপের জয়ী দল একটি সোনার আবরণে মোড়ানো ব্রোঞ্জের রেপ্লিকা পুরস্কার হিসেবে পেয়ে থাকে।

বিশ্বকাপের এ যাবতকালের বিভিন্ন দেশের আসর ও বিজয়ী দেশ: বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২৩টি আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯টি ভিন্ন দেশ এই টুর্নামেন্টের মূল আসর আয়োজন করেছে এবং ৮টি দেশ শিরোপা জিতেছে,

১৯৩০ (উরুগুয়ে): উরুগুয়ে, ১৯৩৪ (ইতালি): ইতালি, ১৯৩৮ (ফ্রান্স): ইতালি, ১৯৫০ (ব্রাজিল): উরুগুয়ে, ১৯৫৪ (সুইজারল্যান্ড): পশ্চিম জার্মানি, ১৯৫৮ (সুইডেন): ব্রাজিল, ১৯৬২ (চিলি): ব্রাজিল, ১৯৬৬ (ইংল্যান্ড): ইংল্যান্ড, ১৯৭০ (মেক্সিকো): ব্রাজিল, ১৯৭৪ (পশ্চিম জার্মানি): পশ্চিম জার্মানি, ১৯৭৮ (আর্জেন্টিনা): আর্জেন্টিনা, ১৯৮২ (স্পেন): ইতালি, ১৯৮৬ (মেক্সিকো): আর্জেন্টিনা, ১৯৯০ (ইতালি): পশ্চিম জার্মানি, ১৯৯৪ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র): ব্রাজিল, ১৯৯৮ (ফ্রান্স): ফ্রান্স, ২০০২ (দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান): ব্রাজিল, ২০০৬ (জার্মানি): ইতালি, ২০১০ (দক্ষিণ আফ্রিকা): স্পেন, ২০১৪ (ব্রাজিল): জার্মানি, ২০১৮ (রাশিয়া): ফ্রান্স, ২০২২ (কাতার): আর্জেন্টিনা, ২০২৬ (কানাডা, মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র):.....

বছর	স্বাগতিক	বিজয়ী দল	অধিনায়ক	প্রধান কোচ
১৯৩০	Uruguay	টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত ARGENTINA	José Nasazzi	Alberto Suppici
১৯৩৪	Italy	ইতালি	Giampiero Combi	Vittorio Pozzo
১৯৩৮	France	ইতালি	Giuseppe Meazza	Vittorio Pozzo
১৯৫০	Brazil	উরুগুয়ে	Obdulio Varela	Juan López Fontana
১৯৫৪	Switzerland	পশ্চিম জার্মানি	Fritz Walter	Sepp Herberger
১৯৫৮	Sweden	ব্রাজিল	Hilderaldo Bellini	Vicente Feola
১৯৬২	Chile	ব্রাজিল	Mauro Ramos	Aymoré Moreira
১৯৬৬	England	ইংল্যান্ড	Bobby Moore	Alf Ramsey
১৯৭০	Mexico	ব্রাজিল	Carlos Alberto Torres	Mário Zagallo
১৯৭৪	West Germany	পশ্চিম জার্মানি	Franz Beckenbauer	Helmut Schön
১৯৭৮	Argentina	আর্জেন্টিনা	Daniel Passarella	César Luis Menotti
১৯৮২	Spain	ইতালি	Dino Zoff	Enzo Bearzot
১৯৮৬	Mexico	আর্জেন্টিনা	Diego Maradona	Carlos Bilardo
১৯৯০	Italy	পশ্চিম জার্মানি	Lothar Matthäus	Franz Beckenbauer
১৯৯৪	United States	ব্রাজিল	Dunga	Carlos Alberto Parreira
১৯৯৮	France	ফ্রান্স	Didier Deschamps	Aimé Jacquet
২০০২	South Korea / Japan	ব্রাজিল	Cafu	Luiz Felipe Scolari
২০০৬	Germany	ইতালি	Fabio Cannavaro	Marcello Lippi
২০১০	South Africa	স্পেন	ইকার ক্যাসিয়াস	ভিসেন্তে দেল বস্ক
২০১৪	Brazil	জার্মানি	ফিলিপ লাম	জোয়াকিম লো
২০১৮	Russia	ফ্রান্স	উগো লরিস	দিদিয়ে দেশঁ
২০২২	Qatar	আর্জেন্টিনা	লিওনেল মেসি	লিওনেল স্কালোনি

সর্বশেষ, ২০২৬ বিশ্বকাপ ১২ জুন শুরু হয়, যা এখনো চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের খেলা সম্পন্ন হয়েছে এবং এরই মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন লিওনেল মেসি(৩)। ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনিই প্রথম এক ম্যাচে হ্যাট্রিক করেন আলজেরিয়া বিপক্ষে। দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ ৭ গোলে এগিয়ে রয়েছে জার্মানি। যেখানে জার্মানি কুয়ারাসাও এর বিপক্ষে ৭/১ এক বিশাল ব্যবধানে জয় লাভ করে। হট ফেবারিট স্পেনকে রুখে দিয়ে নতুন দল কাপু ভের্দে নজর কেড়েছিল ফুটবলপ্রেমীদের। আস্তে আস্তে রোমাঞ্চ ছড়াচ্ছে ২০২৬-এর বিশ্বকাপ। কে হাসবে বিজয়ের হাসি, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে যেদলই জিতুক না কেন, জয় কিন্তু সব সময় ফুটবলেরই।

ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষের আবেগ, স্বপ্ন ও ঐক্যের প্রতীক। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে উরুগুয়েতে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়া আসরে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা, কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের অসাধারণ কীর্তি, নতুন নতুন রেকর্ড এবং প্রযুক্তির বিকাশ বিশ্বকাপকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিশ্বকাপের ট্রফি, মাসকট, থিম সং এবং বৈচিত্র্যময় আয়োজন প্রতিটি আসরকে দিয়েছে আলাদা পরিচয়। চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত এই মহাযজ্ঞ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ নিজেদের প্রিয় দলকে সমর্থন করে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই ফুটবল বিশ্বকাপ কেবল একটি খেলা নয়, বরং বিশ্বজনীন আনন্দ, ঐক্য এবং মানবিক বন্ধনের এক অনন্য উৎসব।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, গুগল

আলোচিত সংবাদ

এবার বড়দিনের আগেই নতুন বই হাতে পাবে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিনের আগেই শিক্ষার্থীরা ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের পাঠ্যবই হাতে পাবে। সোমবার (১৫জুন) রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাঠে আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আশা করছি, এই বছরে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনের আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের বই পৌঁছে দেব। বইগুলি পরিমার্জিত বই এবং বইগুলোর কারিকুলাম অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে আমরা নতুন কারিকুলাম নিয়ে নতুন সিলেবাস নিয়ে আমরা আসতে পারব।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'ইতিমধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বইগুলো পরিমার্জন হয়েছে। চারটি বিষয়ে আমরা বই নতুনভাবে দিচ্ছি এবং এই কর্মযজ্ঞ শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালিয়ে যাচ্ছে।'

https://www.dainikbangla.com.bd/national/77287

দেশব্যাপী ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

দেশব্যাপী ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে কক্সবাজারের পিএমখালীর ডুলাহাজারার মালুমঘাট সংরক্ষিত বনে একটি গর্জন গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা ১১ প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন। জানা গেছে, সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল-ক্ষমতায় এলে সারাদেশে ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে। কক্সবাজারের মালুমঘাটে এই কর্মসূচির উদ্বোধনের মাধ্যমে সরকার তাদের আরেকটি নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করল। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আগামী ৫ বছরে এই বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। প্রথম ধাপে দেশের ৪৯টি জেলার ১৪৯টি উপজেলায় দেড় কোটি চারা রোপণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/06/13/1261601

বাংলাদেশকে নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াটের বেশি নিতে দেবে না ভারত

নেপাল থেকে বাংলাদেশে ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানির কথা থাকলেও ৪০ মেগাওয়াট রপ্তানি করবে তারা। ১৫ জুন, সোমবার থেকে আমদানি শুরু হবে। ভারতের অনুমোদন না পাওয়ায় অতিরিক্ত ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি আপাতত বন্ধ থাকছে। সংশ্লিষ্ট জ্বালানি কর্মকর্তারা বলছেন, ভারতের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ) এখন পর্যন্ত সেই অনুমোদন দেয়নি। কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে কাঠমন্ডু পোস্ট জানিয়েছে, ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (সিইএ) বিদ্যুৎ পরিবহন লাইনের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণ দেখিয়ে অনুমোদন স্থগিত করে দিয়েছে। পাশাপাশি সংশোধিত বা নতুন ত্রিপক্ষীয় চুক্তি এবং নেপাল-ভারত জ্বালানি সচিব পর্যায়ের জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটির (জেএসসি) সিদ্ধান্তসহ আরো কিছু প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি।

https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/06/14/1697528

চীনের অর্থে আরেকটি পদ্মা ও যমুনা সেতুর পরিকল্পনা

চীনের অর্থায়নে দেশের অবকাঠামো খাতে নতুন করে বড় বিনিয়োগ আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দেশে আরও একটি করে পদ্মা ও যমুনা সেতু নির্মাণসহ সড়ক, রেল ও সেতু খাতের ২০টির মতো প্রকল্পের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আসন্ন চীন সফরে এসব প্রকল্পের অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা গেছে, সড়ক, সেতু ও রেল খাতের এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হতে পারে কয়েক লাখ কোটি টাকা। তবে তালিকায় থাকা সব প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন পাওয়া যাবে না বা এখনই সেসব বাস্তবায়ন নাও হতে পারে। তবে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সরকার বেশি জোর দেবে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/um4rbw0bvg

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র অস্থায়ী চুক্তিতে কী আছে, ফাঁস করল ইসরায়েলি গণমাধ্যম

ফাঁস হওয়া তথ্যানুযায়ী, চুক্তির আওতায় এরই মধ্যে ইরান কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র তুলে নিয়েছে তাদের নৌ-অবরোধ। সমঝোতা স্মারকের শর্তানুযায়ী, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের মিত্ররা লেবাননসহ বিশ্বের সব প্রান্তে একে অপরের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের বৈরী ও শত্রুতামূলক আচরণ বন্ধ রাখতে সম্মত হয়েছে। একই সঙ্গে ইরান পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে তারা কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা সংগ্রহ করবে না। বিপরীতে, চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং ইরানের ওপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চুক্তির উল্লেখযোগ্য একটি দিক হলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা। শর্ত অনুযায়ী, ইরান তার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত সরিয়ে ফেলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হয়েছে। আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পারমাণবিক কর্মসূচিতে বর্তমান পরিস্থিতি বা 'স্ট্যাটাস কু' বজায় রাখবে তেহরান। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল আটকে রাখা ইরানি অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দেবে। এছাড়া স্থায়ী সমাধান হিসেবে ইরানের পুনর্গঠনের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল তহবিল গঠনের পরিকল্পনাও এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

https://www.ittefaq.com.bd/794024/

আইএলটিএস পরীক্ষায় ৬২৭৯৪ শিক্ষার্থীর ফলাফল ভুল, ক্ষতিপূরণে কর্তৃপক্ষের যে উদ্যোগ

আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা দক্ষতা পরীক্ষা আইইএলটিএস (IELTS)-এর ফলাফলে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়েছে। কম্পিউটারভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ব্যবস্থার ভুলের কারণে বিশ্বজুড়ে ৬২ হাজার ৭৯৪ জন পরীক্ষার্থী ভুল ফলাফল পেয়েছিলেন। এ ঘটনায় আইইএলটিএসের অন্যতম অংশীদার প্রতিষ্ঠান কেমব্রিজ ইংলিশকে ৮ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৪ কোটি ৪২ লাখ ৪৬ হাজার ২০০ টাকা) জরিমানা করেছে যুক্তরাজ্যের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফকোয়াল (Ofqual)। অফকোয়ালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট থেকে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে আইইএলটিএস পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল। এ সময় বিশ্বজুড়ে প্রায় ৭৭ লাখ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৯৩ হাজার ৮৬৫টি উত্তরপত্র ভুলভাবে মূল্যায়িত হয়, যার ফলে হাজারো পরীক্ষার্থীর ফলাফলে প্রভাব পড়ে। পরবর্তীতে ফলাফল পুনর্মূল্যায়ন করে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ফলাফলে ২০ হাজার ৬০০ জনের বেশি পরীক্ষার্থীর ব্যান্ড স্কোর বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, ১ হাজার ১১৫ জনের ক্ষেত্রে ভুলবশত বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছিল, যা পরে প্রকৃত স্কোর অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়।

|https://www.ittefaq.com.bd/794078/

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র স্পেন সফরের ১০টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

গত ৬-১২ জুন পর্যন্ত পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও স্পেন সফর করেন। এই সফরে তিনি মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন। শান্তি, ঐক্য ও সুসমাচার প্রচারের উদাত্ত আহ্বানসহ ভক্তবিশ্বাসীদের সঙ্গে আবেগঘন সাক্ষাতে পুণ্যপিতা পোপ লিও'র এই সফর ছিল বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ। পুণ্যপিতা স্পেনের সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন এবং ক্রমবর্ধমান ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে বিশ্বাসীদের নিজেদের বিশ্বাসকে নবায়ন করার আহ্বান জানান।

স্পেন সফরের ১০টি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত তুলে ধরা হলো:

১। খ্রিস্টের দেহোৎসব পর্বের শোভাযাত্রায় ১৬ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণ

খ্রিস্টের দেহোৎসব মহাপর্ব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় মাদ্রিদের বিখ্যাত প্লাজা দে সিবেলেসে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। ভক্তবিশ্বাসীরা পুণ্যপিতার পৌরহিত্যে পবিত্র খ্রিস্টযাগ, শোভাযাত্রা এবং পুণ্যসংস্কারের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পোপ মহোদয় বলেন, "খ্রিস্টের দেহোৎসব পর্ব শুধুমাত্র উপাসনার বর্ষপঞ্জির একটি উৎসব নয়; এটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততাকে নবায়ন করার জন্য বিশ্বাসের কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার একটি পথ।"

২। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সফরের তৃতীয় দিনে পোপ মহোদয় স্পেন মণ্ডলীর যাজক ও চার্চম্যানদের দ্বারা নির্যাতিত ছয়জন ভুক্তভোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এক ঘণ্টাব্যাপী এই সাক্ষাতে তারা তাদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার মোকাবেলায় মণ্ডলীর কার্যক্রম আরও কার্যকর করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। পোপ মহোদয় স্পেনের বিশপদের আহ্বান জানান, যেন তারা "শ্রবণ, সত্যতা, ন্যায়বিচার, ক্ষতিপূরণ এবং প্রতিরোধের দৃঢ় অঙ্গীকার" নিয়ে এই সংকট মোকাবিলা করেন। একইসাথে প্রত্যেকজন ক্ষতবিক্ষত মানুষকে যেন আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ ও গ্রহণ করা হয় এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়। যাতে তারা প্রকৃত আরোগ্যের পথ খুঁজে পায়।

৩। স্পেনের সংসদে ভাষণদানকারী প্রথম পোপ

৮ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও স্পেনের সংসদে ভাষণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। স্পেন সফরে তৃতীয় পোপ (পোপ ২য় জন পল ও পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট) হলেও তিনি হলেন স্পেনের সংসদে ভাষণদানকারী প্রথম পোপ। তিনি আইনপ্রণেতাদের মানবজীবনকে গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত সুরক্ষার আহ্বান জানান। ভাষণের শেষে প্রায় সাত মিনিট ধরে করতালিতে মুখর থাকে স্পেনের সংসদ ভবন।

৪। আওয়ার লেডি অব আলমুদেনা প্রতিকৃতিতে 'লাল গোলাপ' উৎসর্গ

মাদ্রিদের প্রতিপালিকা আওয়ার লেডি অব আলমুদেনার ঐতিহাসিক মূর্তিতে পুণ্যপিতা একটি 'লাল গোলাপ' প্রদান করেন, যা পোপীয় সম্মানের অন্যতম সর্বোচ্চ নিদর্শন। পুণ্যপিতা বলেন, "ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতি পুত্রসুলভ ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে আমি তাঁর পদতলে এই লাল গোলাপ অর্পণ করছি।"

৫। নিজের পোপীয় দায়িত্ব মা মারীয়ার হাতে সমর্পণ

মন্টসেরাত মঠে গিয়ে পোপ মহোদয় রোজারিমালা প্রার্থনা করেন এবং আওয়ার লেডি অব মন্টসেরাতের মধ্যস্থতায় নিজের পোপীয় দায়িত্ব ও মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম সমর্পণ করেন। তিনি বলেন, "ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য যে পৃথিবী আকুল হয়ে আছে, সেখানে মণ্ডলীর মিশন আমি আওয়ার লেডি অব মন্টসেরাতের মাতৃসুলভ মধ্যস্থতায় সমর্পণ করছি।"

৬। এক যুবকের রোজারিমালা দিয়ে প্রার্থনা

বার্সেলোনায় সার্জি নামে এক যুবক তার রোজারিমালা পোপ মহোদয়কে আশীর্বাদের জন্য দেন। পোপ সেটি নিজের পকেটে রেখে কিছুক্ষণ পরে সেই রোজারিমালা ব্যবহার করেই প্রার্থনা করেন। সার্জি বলেন, আমি আমার রোজারিমালাটি পুণ্যপিতাকে আশীর্বাদের জন্য দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, এটি কি আমার জন্য! আমি তো না বলতে পারিনি; তাই বলেছি হ্যাঁ। আর তিনিও তা পকেটে পুরে রাখেন। পরে অনুষ্ঠান শেষে পোপ মহোদয় রোজারিমালাটি আবার সার্জির কাছে ফিরিয়ে দেন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

৭। পূজনীয় আন্তনী গাউদির সমাধিতে প্রার্থনা

বার্সিলোনায় সাগ্রাদা ফামিলিয়া ব্যাসিলিকায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের আগে পোপ মহোদয় পূজনীয় আন্তনী গাউদির সমাধিতে প্রার্থনা করেন এবং একটি মোমবাতি জ্বালান। "ঈশ্বরের স্থপতি" নামে পরিচিত গাউদি ছিলেন গভীর বিশ্বাসী একজন কাথলিক যিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সাধুতার স্বীকৃতির প্রক্রিয়া বর্তমানে এগিয়ে চলছে। ১৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস তাঁর পুণ্যগুণের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৮। সাগ্রাদা ফামিলিয়ায় ঐতিহাসিক মিসা

পোপ মহোদয় সাগ্রাদা ফামিলিয়া ব্যাসিলিকায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং যিশু খ্রিস্টের নামে উৎসর্গীকৃত নতুন টাওয়ারের উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন। কাকতালীয়ভাবে যা এই ব্যাসিলিকার স্থপতি আন্তনী গাউদির মৃত্যুর শততম বার্ষিকীতে হয়েছে। পুণ্যপিতা বলেন, "সাগ্রাদা ফামিলিয়া পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচু গির্জা পার্থিব মর্যাদার জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের জনগণকে পথ দেখানোর জন্য।" স্পেনের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে সকল কাতালানরা বার্সিলোনা শহরের এই ব্যাসিলিকায় মিলিত হন।

৯। অভিবাসীদের নৌকার কাঠ দিয়ে তৈরি ক্রুশ আশীর্বাদ

গ্রান ক্যানারিয়ার আরগুইনেগিন বন্দরে পোপ অভিবাসীদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিচিহ্ন ক্রুশ আশীর্বাদ করেন, যা অভিবাসী নৌকার কাঠ দিয়ে তৈরি। এ কাজ করার মধ্য দিয়ে পোপ লিও প্রত্যেক মানুষের মর্যাদার প্রতি এক শক্তিশালী সাক্ষ্য দান করেন। সমুদ্রে প্রাণ হারানো মানুষদের স্মরণ করে তিনি মানব মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানান এবং স্থানটিকে আশার প্রতীকে রূপান্তরিত করেন।

১০। মানবপাচারকারীদের উদ্দেশে কঠোর বার্তা

সফরের শেষ দিনে তেনেরিফে পোপ মহোদয় মানবপাচারকারীদের উদ্দেশে কঠিনবার্তা দেন। তিনি বলেন: "প্রতিটি হারিয়ে যাওয়া জীবন, প্রতারিত প্রতিটি পরিবার, দাসত্বে আবদ্ধ মানুষ, হুমকির মুখে থাকা নারী এবং শোষিত শ্রমিকের জন্য তোমাদেরকে ঈশ্বরের বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে।" তাই "এই শৃঙ্খল ভেঙে দাও। যাদের বন্দি করে রেখেছ তাদের মুক্তি দাও। যা কেড়ে নিয়েছ তা ফিরিয়ে দাও।" মানবপাচারকারীদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান রাখেন, "থামো। অনুতপ্ত হও। এখনও সময় আছে। কারণ ঈশ্বরের করুণা কঠিন পাপীকেও স্পর্শ করতে পারে, তবে তা সত্য, ন্যায়বিচার ও মন-পরিবর্তনের সংকীর্ণ দ্বার দিয়েই প্রবেশ করে।"

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা যুদ্ধের প্রকৃত সমাধান হয়ে উঠুক - পোপ চর্তুদশ লিও

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পোপ লিও সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন: "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত এমন একটি সমঝোতা হয়েছে যা তারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করবে।" কেননা "যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার চেয়ে সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সবসময়ই উত্তম।" পোপ আশা প্রকাশ করেন যে এই সমঝোতা "যুদ্ধের প্রকৃত সমাধান" হয়ে উঠবে এবং বিশ্ব শান্তি, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং সকল মানুষের কল্যাণে নতুন পথ খুলে দেবে।

https://www.ewtnnews.com/vatican/10-of-the-most-powerful-moments-of-pope-leo-xiv-s-trip-to-spain

- তথ্যসূত্র : news.va

চার বন্ধু এবং শিকারী

একদা এক জঙ্গলে চার বন্ধু বাস করত– একটি হরিণ, একটি ইঁদুর, একটি কাক ও একটি কচ্ছপ। তারা খুব ভালো বন্ধু ছিল এবং তাদের বেশিরভাগ সময় একে অপরের সাথে কাটাত। একদিন তারা দেখল, যে খোলা জায়গায় তারা থাকত, সেদিকে একজন শিকারি আসছে। শিকারিটি হরিণটিকে দেখে আনন্দে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "আজ আমি এই হরিণটাকে ধরব আর বাড়ি নিয়ে যাব! এর মাংস দিয়ে আমার বেশ কয়েকদিন চলে যাবে, আর এর সুন্দর চামড়াটাও বাজারে ভালো দামে বিক্রি করতে পারব!" এই বলে শিকারিটি তার ধনুক ও তীর বের করে হরিণটির দিকে একটি তীর ছুঁড়ল। কিন্তু তীরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ধনুক-তীর হাতে শিকারিকে দেখে হরিণটা দৌড়ে গাছের আড়ালে পালাল, কাকটা কাছের গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উড়ে গেল আর ইঁদুরটা কাছাকাছি একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। কিন্তু! কচ্ছপটি ধীরগতির প্রাণী হওয়ায় অন্যদের মতো দ্রুত পালাতে পারল না। শিকারি ভাবল, "কচ্ছপের মাংসও হয়তো খেতে ততটাই ভালো হবে!" এবং দ্রুত তাকে জালে আটকে ফেলল। হরিণটি ধরতে না পারায় শিকারি হতাশ হলেও, কচ্ছপটি পেয়ে সে খুশি হলো যে তাকে অন্তত ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। সে কচ্ছপসহ ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিয়ে তার কুঁড়েঘরের দিকে রওনা দিল। হরিণ, ইঁদুর ও কাক তাদের বন্ধুকে ধরা পড়তে দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাকে বাঁচানোর জন্য তারা একটি পরিকল্পনা করল। শিকারিকে খুঁজে বের করার জন্য কাকটা আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে গেল। তারপর, হরিণটা অলক্ষ্যে শিকারিকে ছাড়িয়ে গেল এবং পথের কিছুটা দূরে গিয়ে মরে যাওয়ার ভান করে শুয়ে পড়ল। শিকারি যখন হরিণটাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল, তখন সে ভাবল, "আমার তীরটা তাহলে হরিণটাকেই লেগেছিল! পালানোর সময়ই নিশ্চয়ই হরিণটা মারা গেছে।" সে তার সাফল্যে খুব খুশি হলো। সে কচ্ছপসহ ব্যাগটি ফেলে দিয়ে হরিণটির দিকে এগোতে লাগল। শিকারিটি কচ্ছপটির পাশ থেকে সরে যেতেই ইঁদুরটি ব্যাগের জালটি কেটে কচ্ছপটিকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু ইঁদুরটি যে তার ব্যাগের জাল কেটে ফেলছে তা শিকারিটি জানতেও পারলো না। শিকারিটি হরিণটির দিকে এগিয়ে গেল। যেইমাত্র সে হরিণটির কাছে পৌঁছাল, সেটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়ে পালাল। শিকারিটি পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেল। হতাশ হয়ে শিকারি কচ্ছপসহ ব্যাগটি আনতে ফিরে গেল। কিন্তু অবাক কাণ্ড! ব্যাগটি খোলা ছিল এবং কচ্ছপটি উধাও হয়ে গিয়েছিল। আজকের দিনটা দুর্ভাগ্যের। আমি হরিণ আর কচ্ছপ দুটোই হারিয়েছি। বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মাথা নাড়িয়ে শিকারিটি বাড়ি ফিরে গেল। চার বন্ধু আবার একত্রিত হলো এবং এরপর থেকে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

চাওয়া আর দেওয়া
সপ্তর্ষি

এমন কোন ধনী নেই,
চায়না কিছু ঈশ্বরের কাছে
ধন সম্পদে ভরা জীবন,
তবুও অভাব তার আছে।
শান্তি, প্রেম আর আশির্বাদ পেতে
করে সে প্রার্থনা
ঈশ্বর বিনা পূর্ণ হয় না,
তার জীবনের সব কামনা।

এমন কোন গরীব নেই,
দিতে পারে না কিছু তাঁরে
ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা,
রাখে তার হৃদয়ের দ্বারে।
দুই হাতে তার আন্তরিকতা,
অশ্রুস্বজল যত প্রার্থনা
ঈশ্বরের চোখে অমূল্য দান,
যায় না কখনো বৃথা।

ধনী চায় তাঁর করুণা,
গরিব দেয় হৃদয়ে তার স্থান
এই বিনিময়ে গড়ে উঠে
ঈশ্বর মানবের মহাবন্ধন।
তাঁর সিংহাসনে সমান মূল্য
সকল প্রাণের আশা
দান ও প্রার্থনায় মিলে মিশে
ফুটে জীবনের ভাষা।

ধনী আসে দান হাতে,
গরীব যায় খালি হাতে
দু'জনই গিয়ে নত হয়,
শেষে ঈশ্বরেরই টানে।
চাওয়া আর দেওয়ার মাঝে
আছে এই বাণী
ঈশ্বরের চোখে পায়
সমান মূল্য গরিব ও ধনী।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

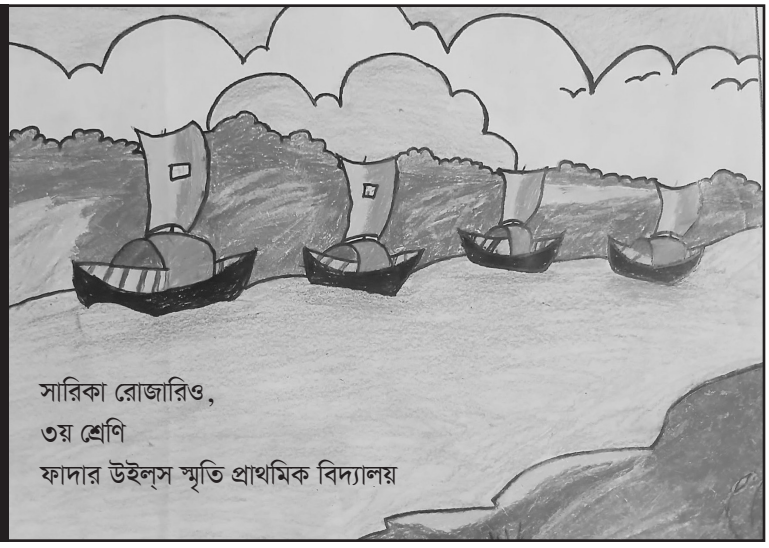

সারিকা রোজারিও,
৩য় শ্রেণি
ফাদার উইল্‌স স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কমলাপুরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হলো মহান সাধু আন্তনীর পর্ব

প্রান্ত গমেজ: ১২ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সাভারের অন্তর্গত কমলাপুর প্রার্থনাগৃহে প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়। উক্ত পর্বদিবসে প্রারম্ভে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি' ক্রুজ ওএমআই। এতে সাভার'সহ বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে শত শত খ্রিস্টভক্তদের সম্মিলিত উপস্থিতিতে প্রার্থনাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ হয়। পর্বীয় দিবসে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নারী সংরক্ষিত আসনের এমপি আন্না মিনজ্, দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) এর প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ চেয়ারম্যান আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ এবং বিভিন্ন সংঘের ফাদার ও সিস্টারগণ। আর্চবিশপ তার উপদেশে সাধু আন্তনীর জীবনী ও শিক্ষা ভক্তজনগণের মধ্যে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধু আন্তনী ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট ধর্ম প্রচারক। তার জীবনী আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ধারণ করতে হবে। খ্রিস্টবিশ্বাস ও খ্রিস্ট প্রেম ছিল সাধু আন্তনীর জীবনের বড় একটি শক্তি। যিশুর সাথে তার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই খ্রিস্টেতে আমার প্রিয়জনেরা আমাদেরও যিশুর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।" খ্রিস্টযাগের পরে এমপি আন্না মিনজ্কে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসেবে সকল ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সাভারে কমলাপুরের আন্তনীর মেলার বিশেষ এতিহ্যবাহী খিচুরী খাওয়ার মধ্য দিয়ে পর্বীয় দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক পবিত্র যীশু হৃদয়ের পর্ব পালন

ফাদার লিয়ন রোজারিও: গত ১২ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র যীশু হৃদয়ের পার্বণ মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ ৩ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত নয়দিনব্যাপী যীশু হৃদয়ের নয়টি গুণ নিয়ে নভেনা ও প্রার্থনা করা হয়। ৭ টি ব্লক, প্রভাত তারা সংঘ, ওয়াইসিএস ছেলে মেয়ে তারা নভেনায় দায়িত্ব পালন করেন। নভেনায় গান, বাণী পাঠ, সার্বজনীন প্রার্থনা, অর্ঘ্য ঢালা নিয়ে আসেন এবং অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভেই পবিত্র যীশু হৃদয়ের নাম কীর্তন করে নয়টি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। এই পর্বদিবসে স্থানীয় ফাদারসহ মোট ১৩ জন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ এবং সেমিনারীয়ানসহ অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উপদেশে বিশপ বলেন, পবিত্র যীশু হৃদয় আমাদের একান্ত আহ্বান জানায়, আমরা যেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকি। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে পবিত্র যীশু হৃদয়ের ভালোবাসা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করি। খ্রিস্টযাগের পর বিশপ মহোদয় পর্বীয় বিস্কুট এবং যীশু হৃদয়ের ছবি আশীর্বাদ করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের 'আর্চ ডায়োসিস' এর ৭৫ বছর পূর্তিতে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ এবং ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্ট্যানিসলাস গমেজ জুবিলীর লগো উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পরে রাঙ্গামাটিয়া মিশন খ্রীষ্টান যুব সমিতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে এবং অন্যান্য যাজকদের ফুলের শুভেচ্ছা জানান এবং বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সম্মিলিত অংশগ্রহণের জন্য খ্রিস্টযাগের পূর্বে এবং শেষে বাদ্য বাজনা থাকে। এতে সকলে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে।

সুরশুনিপাড়ার নবনবিতে সাধু আন্তনীর পর্ব ও শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার সাগর জেমস্ তপ্ন: সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত নবনবি গ্রামে মহান সাধু আন্তনীর পর্ব ও শিশুমঙ্গল দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ জুন পর্বীয় খ্রিস্টযাগ এবং শিশুমঙ্গল দিবসে পাল পুরোহিত ফাদার প্রদীপ কস্তা, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ এবং ফাদার সাগর জেমস্ তপ্নসহ চারশতাধিক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সাঁন্তালী দারাম, পা ধোয়া ও ফুল প্রদানের মধ্য দিয়ে যাজকগণ ও অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা এবং উপদেশ প্রদান করেন ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ। উপদেশে

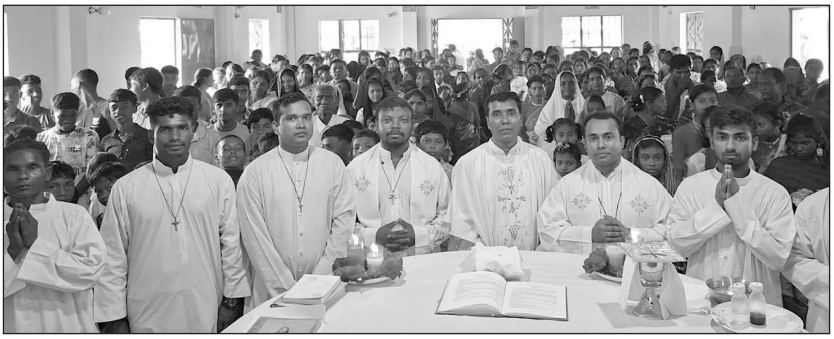

তিনি বলেন, খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমরা যেন মহান সাধু আন্তনীর গুণাবলী অনুসরণ করি। আমরা যেন সাধু আন্তনীর মতো নম্র হতে পারি এবং তাঁর মতো অন্যের সাথে খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের সহভাগিতা করি। খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের অংশগ্রহণে শিশুমঙ্গল দিবস ও প্রার্থনা এবং বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিশুমঙ্গল দিবসে ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা শিশু, ভালোবাসেন যিশু। তাই ভাল শিশু হয়ে তোমরাও যিশুকে ভালোবাসবে। ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা শিশুদের প্রার্থনা শিক্ষা ও গির্জায় প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করার মধ্যদিয়ে সাধু আন্তনীর পর্ব ও শিশুমঙ্গল দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে অনুষ্ঠিত হলো কাটেখিস্ট ও প্রার্থনা পরিচালকদের প্রশিক্ষণ

ফ্লেভিয়ান ডি কস্তা: গত ৮ থেকে ১৩ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বান্দরবান ফিয়াৎ পালকীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো কাটেখিস্ট ও প্রার্থনা পরিচালকদের প্রশিক্ষণ কোর্স। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল বিষয়ক কমিশনের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এতে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের ১১টি ধর্মপল্লী ও ২টি কোয়াজি ধর্মপল্লী থেকে মোট ৪২ জন কাটেখিস্ট ও প্রার্থনা পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল বিষয়ক কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার জয় যোসেফ কুইয়া। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের পালকীয় সমন্বয়কারী সিস্টার মমতা পালমা এলএইচসি। ছয় দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ছিল খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি বিষয়ে ফাদার জয় যোসেফ কুইয়া'র সহভাগিতা, খ্রিস্টমণ্ডলীর সংস্কারসপ্তক (সাতটি সাক্রামেন্ট) বিষয়ে খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লেনার্ড রিবেরুর আলোচনা। এছাড়াও আরো ছিল প্র্যাকটিক্যাল ধর্মশিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে সিস্টার মমতা পালমার সহভাগিতা, ভক্তের জীবনে প্রার্থনার ভূমিকা বিষয়ে ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসির উপস্থাপনা এবং সিনোডাল পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের হেড অব প্রোগ্রামস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মি. মিকি পল গনসালভেসের আলোচনা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ধর্মশিক্ষা প্রদান, প্রার্থনা পরিচালনা, সাক্রামেন্ত বিষয়ক জ্ঞান অর্জন এবং সিনোডাল চার্চের চেতনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও দিকনির্দেশনা লাভ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ ধর্মপল্লীতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টভক্তদের সেবায় আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

তথ্যসূত্র: রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা

হলি রোজারি যুব সংঘের উদ্যোগে শিক্ষা সফর ২০২৬

হলি রোজারি যুব সংঘ: গত ২১ মে - ২৩ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে হলি রোজারি যুব সংঘের উদ্যোগে তিন দিনের শিক্ষা সফর আয়োজন করা হয়। উক্ত শিক্ষা সফরে সক্রিয় সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং তেজগাঁও ধর্মপল্লীর সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, হলি রোজারি যুব সংঘের উপদেষ্টা মিসেস হেলেন কাপালি ও সংগঠনের সম্মানিত সভাপতির উপস্থিতি সফরকে সময়-নিষ্ঠা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছে। ২১ তারিখ ভোর সাড়ে ৬টায় কমলাপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। মোট ১৩জন এই শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করে। এই শিক্ষাসফরের মধ্য দিয়ে অনেক নতুন বিষয় জানা সম্ভব হয়। যেমন, কলাতলী বিচ ও নিটল ব্যা রিসোর্টে অবস্থানকালে পর্যবেক্ষণ করা হয় সমুদ্রনির্ভর মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম। জেলে, হোটেল কর্মী, খাবার বিক্রেতা–সকলের কঠোর পরিশ্রম শেখায়, স্বপ্ন পূরণে ধৈর্য ও অধ্যবসায় জরুরি। সুগন্ধা ও লাবণী বিচের কোলাহল, হকার, পর্যটক ও নিরাপত্তাকর্মীর সমন্বয় বোঝায় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব। ইনানী বিচের স্বচ্ছ নীল জল ও প্রবাল পাথর শেখায় নিজেকে স্বচ্ছ রাখলে জীবনও সুন্দর দেখায়। হিমছড়ির ঝর্ণা ও সবুজ পাহাড় শিক্ষা দেয়, উঁচুতে উঠতে গেলে কষ্ট সহ্য করতে হয়, অধ্যবসায় ব্যতীত কোনো সৌন্দর্য উপভোগই তৃপ্তির হয়ে উঠে না। পাটুয়ার টেকের ঢেউ আর পাথুরে সৌন্দর্য শেখায় প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়। রেজুখালের কাদা চর, জেলেদের মাছ ধরা, বড় সাম্পান ও সারি সারি ঝাউবন দেখে উপলব্ধি–সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রকৃতি প্রশান্তি দেয়। ঝাউবনের দোলনায় দুলতে দুলতে মনে হয়, সরল আনন্দই জীবনের আসল রূপকথা। কাঁকড়া বিচের নির্জন বালুচর ও কাঁকড়ার আত্মরক্ষার কৌশল শেখায় সতর্কতা ও অভিযোজন। বার্মিজ মার্কেটের রঙিন পোশাক, হস্তশিল্প ও আচার ভিন্ন সংস্কৃতিকে সম্মান ও স্থানীয় অর্থনীতিকে সহায়তা করতে শেখায়। চান্দের গাড়িতে পাহাড় বেয়ে ওঠা, সংঘের সদস্যদের একত্রে খাবার খাওয়া, প্রকৃতি উপভোগ, প্রয়োজনে পাশে থাকার মধ্য দিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ আরও দৃঢ় হয়। এই সফর শুধু কক্সবাজারকে পরিচিত করেনি, নিজেদের ধৈর্য, সংগ্রাম ও ঐক্যের শক্তিও নতুন করে চিনিয়েছে। সমুদ্র শিখিয়েছে ধৈর্য একইসাথে ঐক্য শিখিয়েছে দল। সর্বোপরি প্রাণবন্ত এই শিক্ষাসফরে প্রকৃতি, মানুষ ও দল–এই তিন শিক্ষকই হলি রোজারি যুব সংঘের ভবিষ্যৎ কাজের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

২৩ মে দুপুরে পুনরায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়।

নিঃশব্দে চলে যাওয়া'র ৮ বছর

৩০ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত নিকোলাস তিমথী কস্তা

কোন এক শনিবারের সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার আগে
তোমার জীবন ঘড়িটা ডুবে গেলো অচেনা বন্দরে।
তোমার নিঃশব্দ চলে যাওয়া-নিরুত্তাপ চায়ের কাপে,
আজো ভাবায়!!!
বাতাসে কান পেতে শুনি বিয়োগের করুণ সুর।
তোমার চলে যাওয়ায়, অনেক দিন রুদ্ধ হয়েছিল মনের দ্বার,
দু'চোখে অজুত প্রশ্নের নিরুত্তর চেয়ে থাকার কোটি বর্ষ যেন!!!
ধীরে ধীরে, সময়ের বহতা নদীতে,
ডুবে ডুবে সাঁতার কেটে, স্নান সেরে দেখছি-
অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছি তোমাকে ছাড়া।
ভীষণ কষ্টের পাহাড়টায়
আজো মুশলধারে বৃষ্টি নামে
জলে থৈ থৈ করে নয়ন নদী।
বিষন্ন বিকেলে একা, মন পাড়ায়,
তোমাকে মনে পরে-পুকুর পাড়ে,
বাতাবি লেবুর বনে, ভোরের বাতাসে, আমগাছ তলে।
সবাই চুপিসারে বলে যায়, কে বলে তুমি নেই...
তুমি আছো...
ভীষণ ভাবেই আছো মনের মণিকোঠায়,
হৃদয়ের আঙ্গিনায়।।

স্ত্রী : নির্মলা আগ্নেশ কস্তা
বড় ছেলে ও বৌ : তপন কস্তা ও সুমিত্রা কস্তা
মেঝো ছেলে ও বৌ : তাপস কস্তা ও লতা কস্তা
বড় মেয়ে : সিস্টার মেরী অলিম্পিয়া, এসএমআরএ
ও ছোট মেয়ে সিস্টার : মেরী যোসেফিন, এসএমআরএ
ছোট ছেলে : ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা
নাতনি ও নাতি : অতশী, অরিত্রা, লগন ও লিখন কস্তা

রাঙ্গামাটিয়া, জয়রামবের।

বিজ্ঞ/১২৬/২৬

ইউরোপের দেশ মলদোভায়

মলদোভায় সরাসরি নিয়োগ:
১. এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার
২. নির্মাণ কর্মী
৩. গার্মেন্টস কর্মী / দর্জি

জব ভিসার ১০০% গ্যারান্টেড অফার

বয়স: ২২ থেকে ৪৫ বছর / ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণী

সুযোগ-সুবিধা:
১. বেতন: ৫৫০ ইউরো থেকে শুরু
২. ফ্রী অ্যাকোমোডেশন (থাকার ব্যবস্থা কোম্পানির)
৩. অফিসিয়াল ওয়ার্ক পারমিট
৪. পারমিটের মেয়াদ: ১-২ বছর

এছাড়াও জাপান, ইউএসএ, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যাচেলর / মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়াশোনার আকর্ষণীয় সুযোগ।

রোমানিয়ায় নিশ্চিত ওয়ার্ক - পারমিট এবং ভিসার দারুন সুযোগ সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)
হেড অফিস: বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২ (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

আসন সংখ্যা সীমিত
প্রসেসিং সময়: মাত্র ১২০ কর্মদিবস

এখনই যোগাযোগ করুন
+880 19015 19724
+880 19015 19727
+880 19015 19721

বিজ্ঞ/১২৮/২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ২০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20
Regd. No. DA-33
❖ 21 - 27 June, 2026, ৭ - ১৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!
ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব- ২০২৬
মূলসুর: ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী আলোর পথের দিশারী

সম্মানিত সুধী,

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পক্ষ থেকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীর গর্ব ও ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরার শতবর্ষ জুবিলী জয়ন্তী উৎসব ও সেমিনারীর প্রিয় প্রতিপালিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব আগামী ১-২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হবে। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এই সেমিনারীর জুবিলী অনুষ্ঠান ও পর্বে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। বিশেষভাবে যারা এই সেমিনারী থেকে গঠন নিয়ে আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার ও ব্রাদার হয়েছেন এবং একই সাথে যারা এই সেমিনারী থেকে গঠন নিয়ে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত আছেন এবং এই সাথে মাণ্ডলিক কাজকে তরান্বিত করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীকে স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মাতৃগৃহের অবদান অতুলনীয় ও অপরিসীম। তাই ঐতিহ্যবাহী এই সেমিনারীর জুবিলী ও পর্ব অনুষ্ঠানকে সুন্দর, স্বার্থক ও সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আপনাদের উপস্থিতি, প্রার্থনা, পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান একান্তভাবে কামনা করছি।

পর্বকর্তা ২০০০ টাকা (শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষে)
পবিত্র খ্রীষ্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ টাকা
এছাড়াও যারা আর্থিক অনুদান দিয়ে সহায়তা করতে চান তারা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানের সময়সূচী

তারিখ	বিষয়বস্তু	সময়
০১ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (শুধুমাত্র যাজকদের জন্য)	অনুষ্ঠান: "স্মৃতিতে বান্দুরা সেমিনারী"আড্ডা ও সহভাগিতা	
	আগমন এবং রেজিস্ট্রেশন	বিকাল ৪:০০ টায়
	"স্মৃতিতে বান্দুরা সেমিনারী" আড্ডা ও সহভাগিত	বিকাল ৫:০০ টায়
	পবিত্র ঘন্টা	সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে
	রাতের খাবার	রাত ৭:৩০ টায়
০২ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (সকলের জন্য)	উদ্বোধন অনুষ্ঠান	৯:০০মিনিট
	পবিত্র খ্রিস্টযাগ	৯:৩০ মিনিট
	স্মরণিকা উদ্বোধন	১১:৩০ মিনিট
	টিফিন	১২:০০ মিনিট
	স্মৃতি চারণ	১২:৩০ মিনিট
	দুপুরের আহার	১:৩০-৩:০০ মিনিট
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (র‍্যাফেল ড্র)	৩:০০ মিনিট
	টিফিন	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে

মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া
আহ্বায়ক
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রিয় কমিটি
মোবাইল : ০১৭১৮-৪৮৮৫৭৬

ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই
পরিচালক ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী
সেক্রেটারী, জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রিয় কমিটি
ফোন: ০১৭০৯-১০৫৮৯৭

বিকাশ: ০১৯৬১-৯৯৯৩২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org